ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

রত্নসাগর গ্রন্থমালা

রত্নসাগর গ্রন্থমালা—৯

প্রথম মুদ্রণ

১৫ই চৈত্র, ১৩৬২

দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

আষাঢ় ১৩৬৭

প্রকাশক

দেবকুমার বসু

৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড

কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণলিপি

চারু খাঁ

ব্লক

প্রভাত চন্দ্র দাস

১১/১ হরিপাল লেন

কলিকাতা-৬

মুদ্রণ

নিউ শ্রীদুর্গাপ্রেস

শ্রীগৌর চন্দ্র পাল

২/১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

পরিবেশক

গ্রন্থজগৎ। কলিকাতা

বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 'রত্নসাগর গ্রন্থমালার' উদ্দেশ্য। সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
মনোজ ভট্টাচার্য্য
দেবকুমার বসু

উৎসর্গ

অধ্যক্ষ শ্রীজিতেশচন্দ্র গুহ, উপাধ্যক্ষ শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু, অধ্যাপক
শ্রীনক্ষত্রকুমার রায়চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীঅসিত সেন
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

নিবেদন

'ভারতেব ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। নূতন সংস্কবণে ইতিহাসগত পঠভূমি এবং ধনতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত বাজনৈতিক ও সমাজ মানস বিবর্ত্তন প্রসঙ্গে নতুন দুটি অধ্যায় সংযোজিত হ'ল।

পিতৃদেবের (৺ক্ষিতীশ চন্দ্র মৈত্র) প্রেরণায় প্রথম এই পুস্তক রচনার কাজে হাত দিই—তাঁর জীবিতকালে রচনা শেষ করতে পারিনি বলে অপরিসীম ক্ষোভ থেকে গেল।

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ৺ডাঃ মেঘনাদ সাহার কথাও এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বইটি রচনা কালে তাঁর কাছ থেকে অনেক উপদেশ পেয়েছি।

সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব মিণ্টো অধ্যাপক ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন —তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

* * *

ধনতান্ত্রিক বিকাশের অর্থনীতিক পটভূমি, ইংরেজ আগমনের পরবর্ত্তীকালে ভারতের অর্থনীতিক অবস্থা ইংরেজ অনুসৃত শাসননীতি ও তার প্রতিক্রিয়া নূতন অর্থনীতি ও নূতন শ্রেণী, বিদেশে কুলি চালান সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় মানস—এই কটি অধ্যায়ে বইটি সম্পূর্ণ।

বইটিকে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাসও বলা চলে। নির্ভরশীল পরিসংখ্যানের (Statistcal data) অভাবহেতু পরিসংখ্যানের সাহায্যে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করা সম্ভব হ'ল না। সরকারী কাগজ পত্র, কমিটি রিপোর্ট, এবং প্রামাণ্য বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। আমাদের দেশে পরিসংখ্যানের সাহায্যে অর্থনীতিক ইতিহাস, বিশেষ করে শতাব্দী পূর্ব্বের ইতিহাস্ লেখা দুরূহ।

ধনতান্ত্রিক বিকাশের অর্থনীতিক বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ হ'তে হ'লে ও শিল্পগত উৎপাদন, মূল্যস্তর, মূলধন, প্রকৃত মজুরী, জাতীয় আয়, বাজার ও মুদ্রাগত অর্থনীতির পরিধি, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও গতি

প্রকৃতির আলোচনা পরিসংখ্যান—ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশের উল্লিখিত বিষয়গুলির শতাব্দী পূর্ব্বের নির্ভরশীল পরিসংখ্যান আজও দুর্লভ। সংখ্যাতত্ত্বের উদ্ধারের চেষ্টা হওয়া আজ প্রয়োজন।

যতদিন পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে আমরা সার্থক হ'তে না পারছি ততদিন পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার এই সীমাবদ্ধতা আমাদের স্বীকার ক'রে নিতেই হবে।

এই অবস্থায় ইতিহাসগত ঘটনাও বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনৈতিক মানস বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব সমসাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক মানসকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। তাই নিতান্ত দীন ও খর্ব্বিত হলেও ভারতে সেদিন গড়ে ওঠা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক পরিবেশ আমাদের রাজনৈতিক বিকাশকে ও বিবর্ত্তনকে যে ভাবে প্রভাবিত করেছিল তার গতি প্রকৃতিও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা এবারে নূতন অধ্যায় হিসাবে যুক্ত করা হ'ল।

আর্থিক প্রসঙ্গ, ক্রান্তি, ভারতবর্ষ, মানস এবং অভিযাত্রী (আসাম) সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলিতে বইটির বিভিন্ন অংশ ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সম্পাদক মহাশয়দের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

অগ্রজ শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার মৈত্রের উৎসাহ এই বই রচনায় অন্যতম প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে।

প্রকাশক মহলে সুপরিচিত, সুলেখক বন্ধুবর দেবকুমার বসু মহাশয়ের আনুকুল্যেই এই সংস্করণ প্রকাশনা সম্ভব হ'ল। তাঁর কাছে আমি ঋণ স্বীকার করছি।

পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ রচনায় গ্রন্থপঞ্জী ও পাণ্ডুলিপি এবং প্রুফদেখার কাজে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত যদি শ্রীমতী রমলাদেবী মৈত্রেয়ের অকুণ্ঠ সাহায্য না পেতাম তবে এই সংস্করণ প্রকাশে বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটত।

ইণ্ডিয়ান ষ্টাটিষ্টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট
কলিকাতা-৩৫

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

প্রাক্-কথা

আমি শ্রীমান প্রিয়তোষ মৈত্রেয়ের "ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তকে ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন কালে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। এই উন্নতি ও প্রসিদ্ধি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। খ্যাতনামা বিদেশী লেখকগণ লিখিয়াছিলেন যে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের, উৎপন্ন শিল্প সামগ্রী এশিয়া এবং ইউরোপের অনেক অংশে প্রেরীত হইত কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের এবং ইংলণ্ডের শাসন কর্ত্তাদের নানা প্রকার অত্যাচার ও অবিচারের ফলে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হয়। এসকল কথা মনীষি রমেশচন্দ্র দত্ত এবং খ্যাতনামা বিচারকবর মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ ভারতবাসীদিগকে জানাইয়াছেন। প্রিয়তোষ মৈত্রেয়ের আলোচ্য পুস্তকখানি সহজ ও সরল ভাষায় এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত হইয়াছে—ইহার বহুল প্রচার হইলে আমি সুখী হইব।

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪।১এ, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

এম. এ. (কলি), ডি. এস-সি.
ইকন (লণ্ডন), বার-এট-ল

বিষয়সূচী

অর্থনৈতিক পট-ভূমি

(১)

ভারতে ইংরেজ আগমনের সাথে একদিকে যেমন আমাদের সমাজ-মানসের অপরদিকে তেমনি জাগতিক জীবনের আধুনিক-কালীন্ বিবর্ত্তন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ইংরেজ-আগমনের মধ্যে দিয়ে, তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ভারতীয় সমাজ-মানস এক নব-মানসের সাথে পরিচিত হয়। আবার অন্যদিকে ভারতবর্ষ যখন তার সামন্তযুগীয় অর্থনীতির অন্তিম সীমায় উপস্থিত এবং বণিক-তন্ত্রগত মূলধন পরিমাণ ও বিস্তৃতির দিক দিয়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছে, তখন ভারত এক নূতন অর্থনীতিক ক্রিয়া-কর্ম্মের আস্বাদ পেল। অবশ্য এই নূতন অর্থনীতিক ক্রিয়া-কর্ম্মের বৈষয়িক ক্ষেত্র ভারতে মোটামুটিভাবে যদিও প্রস্তুত ছিল, তথাপি বিদেশী ইংরেজ তাদের স্বকীয় স্বার্থে ভারতের মাটিতে এই অর্থনীতির স্বাভাবিক অগ্রগতিকে সেদিন পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে স্তব্ধ করে দিয়েছে। ফলে শেষ অবধি, যে বিবর্ত্তন ঘটেছিল, তা খণ্ডিত ও বিকৃত।

ইংরেজ-আগমনের গুরুত্ব বুঝতে হ'লে, সমসাময়িক অর্থনীতিক কাঠামোর একটি মোটামুটি পরিচয় গ্রহণ করা দরকার।

১৮ শতকের শেষভাগে দেখা যায়, ভারতীয় জনজীবন স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্বয়ং শাসিত কৃষিপ্রধান গ্রামগুলিকে ভিত্তি ক'রে অনমনীয় ও কঠোর অর্থনীতি ও সমাজ-কাঠামোতে আবদ্ধ। এই জীবন-ধারা দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত বলেই বোধকরি, এই সংস্কৃতি ও সমাজ কাঠামো সুসংগঠিত ও দৃঢ়-ভিত্তিক হ'য়ে উঠেছিল। এই জীবন-ধারার ঠাস-বুনুনি সহজেই সেদিন উপলব্ধি করা যেত। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কোথাও কোথাও সামান্য আঘাত লেগে থাকলেও জীবন-যাত্রার কাঠামো অক্ষত ছিল এবং ইংরেজ-আগমনের প্রাক্‌কাল অবধি অনুসৃত হয়েছিল।

গ্রামগুলি সব জাতিভেদ প্রথায় সংগঠিত ছিল আর জাতি (castes)-গুলি ছিল যৌথ পরিবারভিত্তিক। আর তাই ভূসম্পত্তির মালিকানাও ছিল যৌথ।

প্রধান যান-বাহন ছিল সেদিন গরুর গাড়ী—আর যাতায়াত ভ্রমণও ছিল খুব কম। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ—উচ্চতর জীবনমান সম্পর্কে ধারণাও ছিল না। তাই জীবিকা অর্জ্জনের কারণে দেশান্তরে যাবার প্রয়োজনবোধও ছিল না। পরিবারগুলি একই গ্রামে বংশপরম্পরায় সুদীর্ঘকাল বসবাস করত। কালেভদ্রে, ধর্ম্মীয় বা আত্মীয়স্বজনের বিবাহাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রামান্তরে যেতে হত। প্রত্যেকটি পরিবার তাদের দৈনন্দিন সকলপ্রকার প্রয়োজন গ্রাম থেকেই মেটাতে পারত। সামান্য কিছু লোক ছাড়া প্রায় সকল লোকেই ক্ষেত খামারের কাজ করত। অবশ্য খুব সূক্ষ্ম ও সুন্দর হাতের কাজ ও সুদক্ষ কারিগরীবৃত্তিও অন্যতম জীবিকা বলে গণ্য হ'ত।*

চাষের ক্ষেত-খামারগুলি ক্ষুদ্রায়তন-ভিত্তিক ছিল এবং বীজ-নির্ব্বাচন, সার দেওয়া এবং উৎপাদন-পদ্ধতি, বলাই বাহুল্য অত্যন্ত অনুন্নত ছিল—অনেকটা ১৭৫০এর পূর্ব্বের য়ুরোপের মত অবস্থাই চলছিল। জল-সেচের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই খুব শোচনীয় ছিল। বড় বড় খামারের ক্ষেত্রে পশুর সাহায্যেও চাষবাসের কাজ করা হ'ত। তবে যেসব পশুর জন্য স্বল্প ব্যয়ের প্রয়োজন সেইসব পশু এবং সস্তা দরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হ'ত।

চাষী ও কারিগর এবং কারিগরদের মধ্যে বিভিন্ন পর্য্যায়ে ব্যাপক বৃত্তি-বিভাগ প্রচলিত ছিল। প্রত্যেকটি বৃত্তিই বংশগত। শিল্পী, কারিগর এবং নিম্নবৃত্তির লোকেরা বিশেষ বিশেষ পরিবারদের জন্য কাজ করবার বংশপারম্পরিক অধিকার ভোগ করত।

* Every village included within its bounds, besides farmers and priests, a number of artisans whose inherited occupations were to make up goods for local requirments (P—13 Buchanan—Development of Capitalist Enterprise in India.)

জীবন-যাত্রা খুবই সরল এবং অনাড়ম্বর ছিল। কামার, কুমোর, ছুতার, ধোপা, নাপিত, মুচি, তাঁতি, জোলা, গোয়ালা, চৌকিদার এবং মেথর—এরাই সেদিন জীবনযাত্রার সকল প্রয়োজন মেটাতে পারত। এই বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত জনেরা এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা যা উপার্জ্জন করত, তা টাকায় দেওয়া হ'ত না, পণ্যে দেওয়া হ'ত। আর তাও কাজ প্রতি দেওয়া হ'ত না, বছর বা ছয় মাসের কাজের হিসাবে দেওয়া হ'ত। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ দেওয়া হ'ত, কোন ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিশেষ শস্যে দেওয়া হ'ত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক হিসাবে জমির নির্দ্দিষ্ট অংশের ব্যবহারের অধিকারও দেওয়া হ'ত। কি এবং কতটা কাজ করতে হ'বে—তার ভিত্তিতে পরিবারের হিসাব করা হ'ত। যেমন ধোপার বেলাতে পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব ধরা হ'ত। আবার নাপিতের বেলাতে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের হিসাবে ধরা হ'ত। কামার ও ছুতারদের বেলায় কতকগুলি লাঙ্গল তৈয়ারী হ'বে তার ভিত্তিতে অথবা নিযুক্তদলের ভিত্তিতে পারিশ্রমিকের হিসাব করা হ'ত।

সাধারণ কাঁচামাল যা' হাতের কাছেই মিলত তাই উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হ'ত। গ্রামের মধ্যেই যে বনজঙ্গল ছিল তা' থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে ঘরবাড়ী, আসবাব যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈয়ারী করা হ'ত। অবশ্য দু' একটা জিনিষের ক্ষেত্রে লাঙ্গলের ফলক তৈরীর জন্য যে সামান্য লোহা লাগত তা'ও অনেক সময় দূর দেশ থেকে আনতে হ'ত। অর্থাৎ কিবা কাঁচামাল, কিবা তৈয়ারী পণ্য কোনটার জন্যই তেমন যানবাহনের প্রয়োজন ছিল না—আর যেহেতু গ্রামের মধ্যেই সব আবদ্ধ তাই রাস্তাঘাট তেমন সুগঠিত এবং সুদূরপ্রসারী হবার প্রয়োজন ছিল না। আবার বাজার, বাণিজ্যও তেমন ব্যাপক ও সুসংগঠিত ছিল না। কারণ গ্রামের মধ্যেই সবকিছু উৎপাদিত হ'ত, প্রস্তুত হত এবং ভোগ-ব্যবহার করা হ'ত। এইসব স্থানীয় বাজারে বাইরের দু' একটি

গ্রাম থেকে কালেভদ্রে, দূরদেশ থেকে কিছু পণ্য ও ক্রেতাদের আগমন ঘটত। আর তাছাড়া উৎপাদনটা সেদিন নিতান্তই কোনরকমে জীবন-ধারণের উপযোগী পর্য্যায়ে (Subsistence level) ছিল—তাই উদ্বৃত্ত ছিল না ফলে বাজার গ'ড়ে উঠা সম্ভব হয়নি।

ভোগ্য পণ্যের প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। উৎপাদক দ্রব্যের (Producers goods) সংখ্যাও তাই স্বভাবতঃই খুব অল্প ছিল। অতি সাধারণ হাতে তৈরী কৃষি যন্ত্রপাতি ও কুটীর শিল্পের উপযোগী কিছু সামান্য যন্ত্রপাতি প্রচলিত ছিল। কাস্তে-লাঙ্গল, করাত, চরকা ও তাঁত এই ধরণের সাধারণ উপাদান তৈয়ারী হ'ত; অথচ সেগুলি যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হ'ত।

সেদিনের ভারতের কারিগররা কুটীর শিল্পকর্ম্মে সুদক্ষ ছিল; এইসব বৃত্তি সাধারণতঃ বংশ ও জাতিগত ছিল এবং সেদিন তাদের ধারণা ছিল, এইসব বৃত্তি কখনও বদলানো যায় না—কেন না তা' ঈশ্বর-নির্দ্দেশিত। পিতার বৃত্তি সন্তান বিনা প্রতিবাদেই গ্রহণ করত কারণ কোনরূপ আপত্তি করাটা ঈশ্বর ও ধর্ম্ম-বিরোধী ছিল বলেই তাদের বিশ্বাস ছিল।

সেদিনের এই গ্রামীণ অর্থনীতিতে, ক্রেতা, বিক্রেতা, কারিগর শিল্পী কৃষক সবাই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী—অত্যন্ত পরিচিত—আর তাই কেউ কাউকে ফাঁকি দিয়ে বেশী লাভ করবার রীতিটা প্রচলিত ছিল না। ফরিয়াদের (middlemen) মুনাফারও কোন অস্তিত্ব ছিল না।

চিরাচরিত গতানুগতিক বৃত্তি, বহুদিনের প্রচলিত যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির সাহায্যে একই ধরণের উৎপাদন, গরু, মহিষ, উট, গাধা, শূকর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পশুপালনের কাজে বংশানুক্রমিক ভাবে মানুষ নিযুক্ত থাকত—কোন পরিবর্তন চোখে পড়ত না। কেবল ছেদ পড়ত, যদি হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ঘ'টে অন্নাভাব সৃষ্টি করত অথবা পাহাড় পর্ব্বত এলাকা থেকে জমির জন্য আক্রমণ ঘটত।

রাজনৈতিক, কিংবা ধর্ম্ম অথবা বাণিজ্যের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংখ্যক নগরী পরিলক্ষিত হত। সেদিনের গ্রাম-কেন্দ্রিক জীবনে এই নগরীগুলিই ছিল একমাত্র ছেদ। রাজদরবারগুলি উৎপাদনের এক বিরাট অংশ ভোগ করত এবং বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী, পারিষদবর্গও অমাত্যদের পালন করত। দেশের অর্থ-নৈতিক উৎপাদনের যা' উদ্বৃত্ত থাকত তা' সমস্ত জমিদার, রাজাদের বিলাস ব্যসনেই ব্যয় হ'ত। উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহৃত হ'ত না। গ্রামের ও নগরের ভোগ্য কাঠামো ও পণ্যের মধ্যে কোন মিল ছিল না। বেশ কিছু সংখ্যক সদাগর ও কারিগর সেদিন রাজদরবারের ও রাজধানীর জীবনযাত্রার উপযোগী চাহিদা এবং ধনী সদাগর, জমিদার ও তীর্থ যাত্রাদের রপ্তানী বাণিজ্যের চাহিদা মেটাবার কাজে নিযুক্ত থাকত।

অত্যন্ত দক্ষ অসংখ্য কারিগর সূক্ষ্ম নানারকম হাতের কাজের পণ্য তৈরীর কাজে নিযুক্ত থাকত এবং এক শ্রেণীর বণিক এঁদের অর্থ সাহায্য করত। সদাগররা সেদিন বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। শিল্পী, কারিগররা কি এবং কত পরিমাণ উৎপাদন করবে, সে সম্পর্কে নির্দ্দেশের জন্য এবং মূলধন ও বিক্রয়ের জন্য এইসব সদাগরের উপর নির্ভরশীল ছিল।*

য়ুরোপে বা ইংলণ্ডে প্রাক শিল্প বিপ্লব কালে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী জমিদারদের মত কোন শ্রেণীর ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে ১৯ শতকের মধ্যকাল অবধি সেদিন অস্তিত্ব ছিল না—ভারতের এবং এশিয়ার ভূমিব্যবস্থার এ এক অভিনব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা মুসলমান রাজাদের

* "Although many of the goods were sold near hone, such, for example as the cloth produced in Benaresh or Surat for sale to the local pilgrims, artistic specialists, required careful judgements, marketing ability, besides the tying up, of considerable wealth in raw materials during the long-manufacturing process. (Buchanan—Capitalist Enterprise in India.)

রাজত্বকালে যে সকল সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীশ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তাঁরা সেদিন শুধুমাত্র নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি গ্রামের রাজার প্রতিনিধি হিসাবে কর আদায়ের অধিকার ভোগ করতেন। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের কালেও জমিদারদের মত জমির ওপর কোন মালিকানা সেদিনে স্বীকৃত ছিল না। তাঁরা সেদিনে কেবল রাজার জন্য এই সকল গ্রাম থেকে রাজস্ব আদায় ক'রে যা' পেতেন তার একটি অংশ নিজেরা রেখে রাজাকে বাকী অংশ দিতেন।

প্রাক্ বৃটিশ আমলে ভারতের মাটিতে manor ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব দৃষ্ট হ'ত না।

আরও একটী বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন,—সেদিন নবাব, সুলতান, রাজাদেরও জমির উপর কোন মালিকানা স্বত্ব ছিল না। তাঁরা উৎপাদনের একটা অংশ কেবল রাজস্ব হিসাবে পেতেন। ভূমি ছিল গোটা গ্রামীন গোষ্ঠি বা পঞ্চায়েতের মালিকানায় এবং ভূমি কখনই রাজার সম্পত্তি বলে গণ্য হত না। সামন্ততান্ত্রিক ও রাজকীয় কোন ব্যবস্থাতেই সেদিনে জমিতে কৃষককুল ছাড়া অন্য কারও মালিকানা অস্বীকৃত ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান কোন শাসকের আমলে কৃষককুলকে জমির এই মালিকানা থেকে বঞ্চিত করবার কোন চেষ্টাই হয় নি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সেদিন জমিতে কৃষকদেরও ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল না—অধিকার গ্রামের সকল কৃষকের সমষ্টিগতভাবে ছিল। তাই স্যার থমাস মুন্‌রো লিখেছিলেন, Land-Lord System was allien to the Indian tradition.

(২)

১৮।১৯ শতকের পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাস যন্ত্র-শিল্প-আশ্রিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটবার আগে প্রায় সকল দেশেই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো প্রচলিত ছিল। যদিও বিভিন্ন দেশে এই কাঠামো আবার বিভিন্নতর ছিল তবে মূলগত ভাবে একই ছিল। যেমন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং স্বয়ং শাসিত গ্রাম কেন্দ্রিক কাঠামো—আবার য়ুরোপে দেখা যায় serfdom ভিত্তিক কাঠামো। তবে এই কাঠামোর সব ক্ষেত্রেই অর্থ নৈতিক সামাজিক গতির মূল বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একই ধরণের ছিল। প্রথমতঃ দেখি শ্লথ গতি হলেও কৃষি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সাথে সাথে কৃষি আশ্রিত মানুষের ওপর সামন্তদের শোষনের চাপও বেড়ে চলেছিল। তাছাড়া, কৃষি থেকে বিচ্যুত জন ও কৃষি-বিদ্রোহের সংখ্যাও বাড়ছে—তার ফলে সম্ভাব্য (potential) শিল্প শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন ব্যবস্থাতে শ্রম বিভাজন নীতি ও ব্যবস্থা ক্রমশঃই সুদূর প্রসারী হতে থাকে এবং তার সাথে সাথে বণিক শ্রেণী এবং কারিগরদের ক্রমশঃই প্রাধান্য ঘটতে থাকে আর শেষতঃ এই উঠতি এবং ক্রমবর্ধমান বণিক শ্রেণীর ও ধনী কৃষকদের হাতে লক্ষনীয় ভাবে মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে ১৮।১৯ শতকের প্রারম্ভের এমন একটা অবস্থাই চোখে পড়ে। অবশ্য আমাদের দেশে এ অবস্থাটা একটু বিলম্বিত হয়েছিল—কারণটা এখানে আলোচ্য নয়। উল্লিখিত বিভিন্ন অবস্থা ধনতান্ত্রিক বিকাশের অপরিহার্য পূর্বাবস্থা। কার্ল মার্ক্স লিখেছেন, "what enables money wealth to become capital is on the one hand

its meeting with free workers,s econdly its meeting with equally free and available for sole means of subsistence, materials etc., the property of the now dispossessed masses" তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র বণিক মূলধন গড়ে উঠলেই শিল্লায়ন মূলক মূলধনের বিকাশ ঘটে না। আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে যখনই এই বণিক বুর্জোয়া তাদের ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতে সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে তখন তারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে আপোষ করতে দ্বিধা করেনি—অনেকটা বিলম্বিত ধনতান্ত্রিক বিকাশের কালে নিজেদের প্রাধান্য সুরক্ষিত হয়ে গেলে শিল্পগত বুর্জোয়াদের সামন্ত স্বার্থের সাথে শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে আপোষ করতে যাওয়ার মতই। এই বিকাশ মূলধন প্রকৃতি নির্ধারিত। এই মূলধন অর্থ (money) প্রসূত এবং যে সম্পদ অর্থের আকারে রয়েছে সেই অর্থেই মূলধনের অস্তিত্ব। এই কারণেই টাকার প্রচলনগত বিনিময় থেকে এবং প্রচলনগত বিনিময়ের ফল হিসাবেই মূলধন উদ্ভূত হয়ে থাকে। কাজেই ভূমিগত সম্পত্তি থেকে মূলধন গড়ে 'ওঠেনা। মূলধন উদ্ভূত হয় বণিক এবং মহাজনদের সম্পদ থেকে।

পশ্চিম য়ুরোপে বণিকতন্ত্রগত (mercantile) সঞ্চয় বিপুল ঘটেছিল এবং যা উল্লেখযোগ্য তা হ'ল, এই বিপুল সঞ্চয় বিক্ষিপ্ত ছিল না—কেন্দ্রীভূত (concentrated) ছিল। পশ্চিম য়ুরোপের ভৌগলিক অবস্থান বণিক-মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে অনেকখানি অনুকূল ছিল—কেননা, এই দেশে দ্রুত navigation প্রসার লাভ করে এবং তার ফলে maritime ও riparian বাণিজ্য অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। আরও একটা কারণ হ'ল, প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে দরিদ্রতর থাকায় এবং সেদিন অর্থনৈতিক দিক দিয়েও অনেক দেশ থেকে অনুন্নত থাকায় পশ্চিম য়ুরোপ বিভিন্ন ধরণের tropical পণ্য—যেমন চা, মশলা,

নীল প্রভৃতি যা কাছেকুলে পাওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল, সংগ্রহের চেষ্টা করেছে এবং সাথে সাথে প্রাচ্যের অনেক ধরণের বস্ত্র, গহনা, মৃৎশিল্পপণ্য, প্রভৃতি আমদানী করার দিকে নজর দিয়েছিল। ব্যাপক ও সংগঠিত নৌ-যানবাহন ব্যবস্থার সাহায্যে এই প্রচেষ্টা ব্যাপক বাণিজ্যের পত্তন করেছিল এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছিল জলদস্যুতা লুটতরাজ দাস ব্যবসায় এবং সোনার আবিষ্কার। ফলে সেদিন পশ্চিম য়ুরোপের বণিকদের হাতে বিপুল ধন সম্পত্তি সঞ্চিত হয়েছিল।

আরও ব্যাপকতর ও সুসংগঠিত নৌ-যানের (navigation) তাগিদে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটতে থাকে এবং উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন পদ্ধতি অনুসৃত হতে থাকে। জাহাজ তৈরীর কারখানা, নৌ আভিযানের ও ব্যবসায়ের খাতিরে বিদেশ যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের পণ্য উৎপাদন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিত্তবান বণিক শ্রেণী এই সব পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে পণ্য তৈরীর (manufacturing) দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ধনী কারিগর (artisan) বিত্তবান ব্যবসায়ীদের অর্থের সহযোগে তাদের ক্ষুদ্রায়তন কারখানারী (manufacturing) কাজ প্রসারিত করতে থাকে। শুধু তাই না, ধনী জমিদাররাও খনি প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের কাজে অগ্রসর হয়েছিল। অর্থাৎ বণিক মূলধন (mercantile capital) ক্রমশঃই শিল্পগত মূলধনে রূপান্তরিত হবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিবেশের সার্থক রূপ নেওয়ার পক্ষে যে সর্ত অপরিহার্য তা হ'ল রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও রাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন। বণিক পুঁজি-পতি শ্রেণী নিজে থেকে কখনই শিল্পগত পুঁজিতে ও ধনতন্ত্রে রূপ নেয় না। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন আর তাই এই রূপান্তর কালে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের বদলে ধনতন্ত্র আশ্রিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। এই ধনিকশ্রেণী সেদিন ধনতান্ত্রিক সমাজের সংযত শক্তি রাষ্ট্রকে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে অতি দ্রুত

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের কাজে ব্যবহার করেছে। এই হ'ল পশ্চিম য়ুরোপে মূলধন সঞ্চয় এবং তার শিল্পায়নে রূপান্তরের ইতিহাস।

আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড ও কানাডায় এই ইতিহাসের গতি একটু অন্য রকম। পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদ অনুপ্রবেশ কালে এই সব দেশে একবারে আনকোরা নূতন ক্ষেত্র পেয়েছিল—স্নুরু থেকে কোন সময়ের জন্যেও ভিতর থেকে সামন্তযুগীয় বিধি-ব্যবস্থার কোন বাধার সন্মুখীন হ'তে হয়নি এবং নির্ঝঞ্ঝাটে উৎপাদন মূলক সম্পদের বিকাশের চেষ্টা করেছে। পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদী উদ্যমকে এসব দেশে সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের সাথে ক্রমাগত বিবাদের মধ্য দিয়ে অথবা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিধি ব্যবস্থার কোন বাধাকে পদে পদে অতিক্রম করতে গিয়ে শক্তি হারাতে হয়নি। এই সব নূতন দেশে "মজ্জাগত পুঁজিবাদী" পশ্চিমীদের স্থায়ীভাবে অনুপ্রবেশ ঘটে। আর কোন বাধা পেতে হয়নি বলে খুব দ্রুত শিল্পআশ্রিত ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটান সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ এই সব নূতন দেশে পশ্চিম য়ুরোপ থেকে মূলধন নিয়ে এসে societal vacum অবস্থায় শিল্পায়নের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করা হয়।

জাপান ছাড়া ভারত, চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এশিয়ার এইসব দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কুটির শিল্পজাত পণ্য য়ুরোপীয় বণিকদের আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু আমেরিকার মত এদেশে তাদের অনুপ্রবেশ নির্বাধ হয়নি। কেননা এসব দেশে য়ুরোপীয়দের সমৃদ্ধিশালী এবং অতি প্রাচীন সংস্কৃতির সন্মুখীন হ'তে হয়েছিল—সমাজ ব্যবস্থা তখনও প্রাক্-ধনতান্ত্রিক অথবা কোথাও কোথাও ধনতন্ত্রের শৈশবাবস্থায় ছিল। তাই পশ্চিমী আগন্তুকরা এখানে আমেরিকার মত স্থায়ীভাবে বসবাসের কথা না ভেবে ধন-সম্পদ পণ্য যথাসম্ভব সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল। অর্থনীতির ইতিহাস পণ্ডিত লিখেছেন, "They

engaged in outright plunder or in plunder thinly veiled as trade, seizing and removing tremendous wealth from the places of penetrations." এইভাবে লুঠ করে বিপুল সম্পত্তি সেদিন তারা নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে মূলধনে রূপান্তরিত করেছিল। ডিগবি সাহেব হিসেব কষে দেখিয়েছিলেন, ইংলণ্ডের ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাল—পলাশীর যুদ্ধ থেকে ওয়াটালু'র যুদ্ধ পর্যন্তকাল। এই সময় ভারত থেকে ইংলণ্ডে ৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড থেকে ১০০,০০০,০০,০০ পাউণ্ড নিয়ে যাওয়া হয়। অধ্যাপক কে, টি, শাহ এবং খাম্বাটা এক হিসেবে দেখিয়েছিলেন, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগেরও বেশী ইংরেজ আত্মস্মাৎ করেছে। মেকলে, ক্লাইভ সম্পর্কে লিখেছেন, We may safely affirm that no Englishman who started with nothing has ever, in any line of life created such a fortune at an early age of 34; out takings of Clive, either for himself or for government were triffling compared to the wholesale robbery and spoliation which followed his departure, when Bengal was surendered a helpless prey to a myrriad of greedy officials……This misgovernment of English was carried to a point such as seems hardly compatible with the very existence of society. The Roman proconsul, who, in a year or two, squeezed out of a province the means of rearing marable palaces and baths on the shore of campania, of drinking from amber, of feasting on singing birds, exhibiting armies of gladiators and flocks of camelopards, the Spanish Viceroy, who *leaving behind him the curses of*

Mexico or Lima, entered Madrid with a long train of gilded coaches and of sumpter horses trapped and shod with silver, were now out done." এই বিবরণ থেকে ভারতের বিপুল সম্পদের কি অপব্যবহার ঘটেছে তার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, ১৭৬০ সাল অবধি ইংলণ্ডে বস্ত্র বোনার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হত তা তদানীন্তন ভারতে ব্যবহৃত যন্ত্রের মত সাদাসিধে ও অনুন্নত ছিল। পল ব্যারাণ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "Indeed whatever may have been the fractional increase of western Europes national income derived from its overseas operations, they multiplied the economic surplus at its disposal. What is more ; the increament of the economic surplus appeared immediately in a concentrated form and came largely into the hands of capitalists who could use it for investment purposes.

The intensity of the boost to West Europes development resulting from this, "exogenous" contribution to its captial accumulation can hardly be exaggerated.

'পৃষ্ঠপোষক' এই পশ্চিমীদের এশিয়ায় অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। পশ্চিমীদের অনুসৃত নীতি এশিয়ার দেশগুলির স্বাভাবিক অগ্রগতিকে জোর ক'রে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং এই দেশগুলির প্রাক ধনতান্ত্রিক কাঠামোর পচনশীলতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। বহু প্রাচীন স্বয়ং-সম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতিকে রপ্তানীযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের দিকে মোড় ঘুরিয়ে পশ্চিমী ধনতন্ত্র এই সব দেশের প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্বয়ং শাসিত, স্বয়ং নির্ভরশীল গ্রামীন জীবন-যাত্রার ধ্বংস সাধন করেছিল এবং চাষের জমি বিদেশীরা

জোর ক'রে আবাদী চাষের কাজে ব্যবহার সুরু করে ও দেশের কুটীর শিল্পকেও নানাভাবে আঘাত করে। ফলে, ব্যাপক ভূমিহীন কৃষকের আবির্ভাব ঘটে। সাথে সাথে ধনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থানুযায়ী, 'Law and order' এর ব্যবস্থাও তাদের স্বার্থে তারা অবলম্বন করেছিল।

এই প্রকারে ধনতান্ত্রিক বিবর্তনের পক্ষে অত্যাবশ্যক অবস্থার একদিকের যেমন পত্তন ও বিকাশ ঘটেছিল, তেমনি অপর দিকের বিকাশ জোর ক'রেই স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই সব দেশের পূর্বে সঞ্চিত বিপুল সম্পদ ও তৎকালীন্ উৎপাদিত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পশ্চিমীরা নিজেদের দেশে চালান করে দিয়ে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্যতম সর্ত প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চয় ব্যাহত করে। যদিও পণ্যের ব্যাপক সঞ্চালন (circulation) বিপুল সংখ্যক নিঃস্ব কৃষক ও কারিগরের উদ্ভব, এবং পশ্চিমের উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সঙ্গে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে খুবই অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল! কিন্তু বিদেশীরা নিজেদের স্বার্থে এই অগ্রগতিকে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত না ক'রে আধাসামন্ত-তান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করেছিল।

অর্থাৎ পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যে যে হতভাগ্য দেশগুলি পড়েছিল তাদের কপালে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্রুততালে সাম্রাজ্যবাদী রূপান্তরের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর দিকটাই জুটেছিল।*

বিদেশীদের শোষণ ক্রমশঃই বেড়ে চলছিল; কিন্তু এই শোষণের ফল, এদেশের মাটিতে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত

*"To oppression by their feudal lords, ruthless but tempered, tradition was added domination by foriegn and domestic capitalists callous and limited only by what traffic would bear. The obscurantism and arbitrary violence inherited from their feudal past was combined with the rationality and sharply calculating capacity of their capitalist present.

হয়নি। প্রায় সবটাই দেশের বাইরে চলে যায় এবং সামান্য কিছু দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরগাছা ধণিক-শ্রেণীর শোষণ কার্যে ব্যবহৃত হয়। জনসাধারণ অসহ্য দুঃখে দিন কাটায় কিন্তু সুখের অদূর ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিতই তারা পায় না; তারা ধনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থায় দিন কাটায় কিন্তু এই কাঠামোতে মূলধন সঞ্চয় ঘটে না। তারা তাদের বহুদিনের জীবিকা হারালো কিন্তু নূতন জীবিকার ব্যবস্থা হ'ল না। পশ্চিমের উন্নত বিজ্ঞানের আলোয় তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল কিন্তু তবুও তারা সেই অনুন্নতির আঁধারেই রইল পড়ে।

কোম্পানীর আমলের প্রাক্‌কাল

সতের শতক থেকে সুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি কাল ভারতের অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই কালে ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা বিগত দিনের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে বিধ্বস্ত করে এক নূতন অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির সংকেত দেয়। তবে একথা সর্ব্বজন-বিদিত ও স্বীকৃত, সেদিনের এ পরিবর্ত্তন এদেশের মঙ্গলকে উদ্দেশ্য করে ঘটেনি বা স্বাভাবিক ভাবেও ঘটেনি। সেদিন ইংলণ্ডে ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছিল সে সকল দেশের ক্রমবর্দ্ধমান জনসমষ্টির প্রাণ ধারণের তাগিদে। সেদিনের চলতি অর্থনৈতিক কাঠামোয় এই ক্রমবর্দ্ধমান জন-সমষ্টির প্রাণ ধারণ ক্রমশঃই অসম্ভব হয়েছিল। তাই পুরানো কৃষি-শিল্প-গত অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রাধান্য গেল, এল যন্ত্র-শিল্প-গত অর্থনীতির যুগ এসকল দেশে। আর এই পরিবর্ত্তনের প্রথম সূচনা সেদিন হ'য়েছিল ইংলণ্ডে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরিবর্ত্তনের পাথেয় বহন করতে হয়েছিল ভারতের। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল; সেদিন ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব-প্রচেষ্টার সাফল্যের উপাদান যোগাতে

গিয়ে ক্রমশঃ যন্ত্র-শিল্প-গত অর্থনীতির দীন-বিকাশ ঘটেছিল আমাদের দেশে। অবশ্য সেই বিকাশ, খর্ব্ব, বিকৃত এবং অসম্পূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ আর শেষ থেকেও গেল তাই। কারণ এই বিকাশের মূলে জাতীয় অর্থনৈতিক শক্তির নেতৃত্ব ছিল না, ছিল তাগিদ কিন্তু নেতৃত্ব ছিল বিদেশী বণিক শক্তির হাতে তাদের স্বদেশের চাহিদা মেটাতে। ফলে, পঙ্গু-বিকার-গ্রস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হল। ইংলণ্ডের সেদিনের শিল্প বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া রূপ নিয়েছিল, সেদিনের কুটির-শিল্প-প্রধান, বৈদেশিক বাণিজ্যে সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষের কেবলমাত্র কৃষি-নির্ভর-শীল দীন অর্থনৈতিক আবর্ত্তনে। এই আবর্ত্তনের পেছনে ইংরেজ বণিক মধ্যবিত্ত শিল্পপতিদের স্বদেশে ও ভারতে অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গের সভ্য খ্যাতনামা হেন্‌রী স্যার জর্জ্জ টুকার ১৮২৩ সালের উক্তিকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।*

কৃষি ও কুটির শিল্পের যুগ্ম উৎপাদন পদ্ধতি ছিল ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট বিদেশী ও বিদেশী উৎপাদন ব্যবস্থার আগমনের প্রাক্‌কালে। বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ডাঃ রাধা-কমল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ভারত যে অর্থনীতিক কাঠামোতে ১৭ শতকে জগতের সর্বাপেক্ষা ধনীদেশ—এশিয়ার কৃষিজননী এবং তৎকালীন সভ্যতার শিল্প-কারখানাগৃহ বলে বিখ্যাত ছিল সেই প্রাচীন অর্থনীতি থেকেই এই নূতন অর্থনীতির উদ্ভব।

*'What is the comercial policy which we have adopted in this country in relation to India ? The silk and cotton inter mixed have long since been excluded altogather from our market; and at late partly in consequence of the opration of a duty of 67 percent of superior machinery the cotton fabrics, which hitoerto constituted the staple of India have not only been displaced in this country but we actually export our cotton manufactures to supply a part of our consumption of our Asiatic possessions. India is thus reduced from the state of manufacturing to that of an agricultural country.' (Memorial of an Indian Govt. P. 494).

সতের শতকে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের বাণিজ্যিক অভিযান য়ুরোপ-এশিয়ার মধ্যে যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে, সেই থেকেই সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক ঐক্যের সূত্রপাত হয়। সেদিন এই আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের কাঠামোর কেন্দ্রস্থল ছিল ভারত। কারণ ভারতবর্ষ এর আগে থেকেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে খাদ্যদ্রব্যের এবং য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে বস্ত্র, পশম এবং নানাপ্রকার বিলাস দ্রব্যের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ ছিল। আর এর বিনিময়ে ভারতবর্ষের বাণিজ্যপোত ঐ সকল দেশ থেকে মূল্যবান ধাতু বয়ে নিয়ে আসতো এবং সেগুলিকে এদেশে মুদ্রায় রূপান্তর করা হ'ত। এই প্রকারে দেশের ধন ঐশ্বর্য্য বেড়ে চলেছিল। কিন্তু কালক্রমে এই নূতন আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামো আঠার শতকের মধ্যভাগে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় ইংরেজের নূতন ধনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক আদর্শে গড়ে উঠছিল—এই দেশগুলির সেদিনের চল্‌তি অর্থনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করে। এই ধততান্ত্রিক বিকাশের সাথে সাথে ভারত তার পূর্ব্বের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক প্রাধান্য থেকে ক্রমশঃই অপসারিত হ'তে থাকল। প্রধানতঃ দুটি কারণে—প্রথমতঃ যন্ত্র শিল্পের সাথে কুটির শিল্পের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পরাজয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতে আগত নূতন শাসকবর্গের প্রবর্ত্তিত দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য দ্রব্যের উপর কড়া হারে শুল্ক এবং অপরাপর আইনী ও বে-আইনী বাধানিষেধ নিজেদের পণ্যের জন্য বাজার দখলের প্রচেষ্টায়। বৃটিশ ধনতান্ত্রিক বিকাশ এদেশে সুরু হল বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর উপকূলে। এই বিকাশের সাথে ভারতের উত্তরকালীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য, ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন এই বিকাশের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্মারক পত্র। মূল আলোচনায় আসবার আগে বৃটিশ ধনতান্ত্রিক

বিকাশের পূর্ব্বেকার ভারতীয় বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটা হিসাব নিকাশ হওয়া ভাল।

এদেশে বিভিন্ন বণিক কোম্পানীগুলি আসবার বহু পূর্ব্ব থেকেই ভারতের বস্ত্র-শিল্পের জগৎ জোড়া খ্যাতি ছিল, তার বাজার ছিল বিশ্বের প্রায় সকল জায়গাতেই। ডাঃ কে, কে, দত্ত এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, অত্যন্ত উঁচুদরের কার্পাস বস্ত্র সেদিন ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে তৈয়ারী হ'ত এবং য়ুরোপে ও অন্যান্য জায়গায় সেই বস্ত্র রপ্তানী করে বিনিময়ে প্রচুর সম্পদ সেদিন এদেশে আসত। অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থনীতিক উদ্বৃত্ত সঞ্চয় ঘটেছিল।

এই শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, গুজরাটের, খান্দেশের বুরহানপুরে, বারাণসীতে, জৌনপুরে, পাটনায়, যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং উড়িষ্যার বাংলার বিভিন্ন সহরে ও গ্রামে! ওলন্দাজ কর্ম্মচারী মিঃ পিলসার্ট বলেছিলেন, 'পূর্ব্ববঙ্গের ছাতাসপুর সোনারগাঁ থেকে সুরু করে উড়িষ্যার পুরী অবধি সকল স্থানের লোকের জীবিকা এই বয়ন-শিল্পে নির্ভরশীল ছিল। এদের তৈরী পণ্যের চারিদিকে খুব খ্যাতি ছিল। গুণের দিক দিয়ে মসলিন, বিশেষ করে সূক্ষ্ম মসলিন, অন্যান্য যে কোন স্থানের মসলিনের চেয়ে দীর্ঘ এবং প্রশস্ত ছিল (Remonstrantic of Francisco Pelsært Translated by Moreland and Geyt) সতের শতকে য়ুরোপের পর্য্যটক বার্নিয়ার লিখেছিলেন, বাংলা দেশে কার্পাস ও পশম দ্রব্যের এত প্রচুর উৎপাদন হ'ত যে এ দেশটাকে কেবল মাত্র হিন্দুস্থান বা মোগল সাম্রাজ্যের এইটি দ্রব্যের ভাণ্ডার না বলে প্রতিবেশি দেশগুলি এমন কি গোটা য়ুরোপের ভাণ্ডার বলাই সঙ্গত।'

'Cotton cloths of super quality manufactured in an extensive scale in different parts of the country were carried as export to Europe and other regions with corresponding economic profit for India in the shape of wealth, (Cal Reveiw, Jan, 1951)

আঠার শতকের সুরু থেকেই ভারতের রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়া আরম্ভ হয়। কিন্তু আঠার শতকের মধ্যভাগের উত্তর কালেও ভারত তার পূর্বতন শিল্প-প্রচেষ্টা ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য অব্যাহত রেখেছিল।

সেদিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাংলার অনুকূলে এবং জগতের অন্যান্য দেশের প্রতিকূলে ছিল। এই বাংলাদেশেই যত সোণা জহরৎ গিয়ে জমা হ'ত এবং সেগুলির কোনদিন ফেরৎ আসবার কোন সম্ভাবনা থাকত না।

সূক্ষ্ম মসলিনের জন্য গোটা য়ুরোপ ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং ভারতও যত দিন যায় ততই এই মসলিন উৎপাদনে সার্থকতার চরম সীমায় উঠছিল।

অতি প্রাচীন কাল থেকে ১৮ শতক অবধি ভারতবর্ষ প্রায় সারা পৃথিবীর বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র বলে গণ্য হত। একটি ওলন্দাজ বিজ্ঞাপনে সেদিন লেখা ছিল, Every one from the Cape of Good Hope to China, man and woman, is clothed from head to foot in the cotton fabrics of India. (উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে চীন পর্য্যন্ত সকল দেশের প্রত্যেকটি স্ত্রী-পুরুষ ভারতের তৈরী সূতীর পোষাক পরিধান করতেন।) এই সময় প্রত্যেকটি গ্রাম স্ব স্ব প্রয়োজনানুযায়ী কার্পাস ও পশম বস্ত্র তৈয়ারী করত। Robert Orme লিখেছিলেন, সেদিন এমন একটা গ্রাম খুঁজে পাওয়া যেত না, যেখানে প্রত্যেকটি স্ত্রী ও পুরুষ, শিল্প-বস্ত্র তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত ছিল না। ডাঃ বুকানন ১৮০০ সালে একটা হিসাব নিয়েছিলেন। সেই হিসাব মত দেখা যায় বিহারে তাদের সংখ্যা ছিল, ৩৩০০০০০ জন—এরা কিন্তু সবাই স্ত্রীলোক। সাহাবাদ জেলায় এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল, ৫৯৫০০ জন তন্তুবায়িনী। আর ভাগলপুর জেলায় ১৬০০০০০ জন এবং গোরক্ষপুরে ১,৭৫,৬০০ জন।

সূতী বস্ত্র শিল্পের সেদিন চারটী প্রধান এলাকা ছিল, ঢাকা জেলা, মছলিপত্তম, করোমণ্ডল এবং কাম্বেসহ গুজরাট।

সেদিনের ভারতের লৌহ-শিল্পের কথা বলতে গিয়ে Justice Ranade লিখেছিলেন, লৌহ শিল্প কেবলমাত্র দেশীয় চাহিদাই মেটাত না, বিদেশে লোহার তৈরী পণ্যদ্রব্যাদি রপ্তানিও করত। এই শিল্পের তৈরী পণ্যের পৃথিবী জোড়া খ্যাতি ছিল। আসামে সেদিন যে কামান প্রস্তুত করা হত তা ছিল খুব উৎকৃষ্ট এবং খুব উন্নত ধরনের। তাছাড়া, সূক্ষ্ম মসলিনের জন্য গোটা য়ুরোপ ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং ভারত যতদিন যায় ততই এই মসলিন উৎপাদনে সার্থকতার চরম সীমায় উঠছিল। পৃথিবী-বিখ্যাত দামাস্কাস ব্লেড ভারতীয় ইস্পাত থেকে তৈয়ারী হ'ত; এবং সুদূর দেশ থেকে পার্শী বণিকরা সুদীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে ভারতে আসতেন এই ইস্পাত সংগ্রহের জন্য এবং এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় আবার সেগুলি রপ্তানী করতেন। এই ব্যবসায় তাঁদের খুব লাভ হ'ত।*

Imperial Gazetter of India সেদিন লিখেছিলেন,—

এখানে একটা কথা স্মরণীয়, প্রাক্-শিল্প বিপ্লব যুগে অর্থাৎ কৃষি ও কুটির শিল্পের কালে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক সংস্থা ছিল গ্রাম কেন্দ্রিক। প্রত্যেক পরিবার ছিল এক একটি অর্থনৈতিক একক (Unit)। এর কারণ সেদিন কৃষিই ছিল জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন—কৃষি অর্থনীতি ছিল সেদিনের অর্থনীতি। অবশ্য কৃষি কাজের slack season বা অবসর কালে সেদিনের মানুষ তাদের শ্রম নিয়োগ করত কুটির শিল্পের কাজে,—কুটির শিল্প ছিল তাদের উপবৃত্তি। কুটির শিল্প তাদের চাষ বাসের যন্ত্র,

---

*Indian Wootz or steel furnished the materials out of which Damascus blades with a world wide reputation were made; and it paid Persian merchants in those old times to travel all the way to India to obtain those materials and export them to Asia. (Justic Ranade: Cf. Decay of Indian Industries.)

*'The high quality of Native made iron, the early anticipation of the processes now employed in Europe for the manufacture of high class steels, the artistic products in copper and brass gave the country a prominent position in the ancient metallurgical world.'

পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সরবরাহ করত। ভারতের কথা উল্লেখ করে Robert Orme তাঁর History of the Military transaction of the British Nation in Indosthan (vol. II P.4) নামক বইতে লিখেছেন—কৃষিকাজের অবসর সময়ে কৃষকরা তাঁতের বস্ত্র বোনারও কাজ করত ফলে বাংলাদেশে কার্পাস ও পশম বস্ত্রের উৎপাদন অন্যান্য জায়গার তুলনায় অনেক বেশী হ'ত এবং স্বভাবতঃই স্বল্প খরচে হ'ত! এই পণ্যের ও কাঁচা পশমের অধিকাংশই য়ুরোপে যেত এবং বাকীটা স্থল ও জলপথে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যেত।*

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত বস্ত্র শিল্প, লৌহ শিল্প প্রভৃতি কুটির শিল্পের কেন্দ্র ছিল আমাদের গ্রামগুলি। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পুঁথি Decay of Indian Industriesএ লিখেছিলেন স্বভাবতঃই সেদিন ভারতের প্রাচীন লৌহশিল্পের কেন্দ্রস্থল ছিল গ্রামগুলি। গ্রামই ছিল সেদিন লৌহ শিল্পের কেন্দ্র। গ্রাম্য কর্ম্মকার জমি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি এবং পল্লী জীবনে বসবাস ও বেশ বিন্যাসের জন্য দরকারী অপরাপর দ্রব্যাদি সরবরাহ করত। এছাড়া যুদ্ধ বিগ্রহ দস্যু তস্কর বিতাড়নের সকল প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার অস্ত্রাদি তৈয়ারী হত এ সকল গ্রাম্য কামারশালা থেকে। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কলের আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য মারণাস্ত্র এই শিল্পের আধুনিক অগ্রগতিকে মারাত্মক আঘাত করে। এই শিল্পের পতনের মূলে আরও দুইটি কারণ রয়েছে। প্রথমটি সেদিনের নবাগত ইংরাজ শাসকের প্রবর্ত্তিত Arms Act. এদেশে

*The vacation from the agriculture left a much greater number of inhabitants, than can be spared in others at leisures to apply themselves to the loom, so that more cotton and silk are manufactured in Bengal than in thrice the same extent of country, throughout the empire and consequently at much cheaper rates. The greater part of those manufactures and of the raw silk is exported and Europe receives the largest share ; the rest goes by land and sea to different parts of the world.

অরাজকতা বন্ধের নামে বিদেশী সরকার যে আইন করলেন তার স্বার্থে তাদের দেশের অস্ত্রশিল্পে এদেশের বাজার দখলের পথ পরিষ্কার হল। স্বনামখ্যাত Eadon Powel লিখেছিলেন "Very few of the book-makers who still remember the silk days or have learnt from the armours of those times, hold licence and are able to apply their trade." দ্বিতীয় কারণ হল, বিদেশীদের সাথে প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের পরাজয়। ভারতের গ্রাম-কেন্দ্রিক-পরিবার ভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষমতা সম্পন্ন শিল্প দ্রব্যের পক্ষে বিদেশের বৃহৎ যন্ত্র চালিত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় পরিচালিত অল্প খরচে তৈয়ারী উন্নত ধরনের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এর সাথে আবার যুক্ত হয়েছিল সেদিন সরকারী পক্ষপাতিত্ব। য়ুরোপীয়দের উন্নত উৎপাদন পদ্ধতির সাথে প্রতিযোগিতায় দেশী-শিল্পপতিরা সুবিধা ক'রে উঠতে পারছিলেন না। জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য বনের কাঠ সরকারী নির্দ্দেশে নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়ার ফলে সেদেশের শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদন খরচা বেড়ে গেলেই দাম বাড়ে। ফলে প্রতিযোগিতার দিনে বাজার হয় হাতছাড়া। উল্লিখিত কারণগুলি অবশ্য অধিকাংশই সেদিনের আমাদের সকল কুটিরশিল্পের পতনের কারণ হিসেবে প্রযোজ্য!

সেদিন ওয়েলেসলির নির্দ্দেশে ডাক্তার বুকানন হ্যামিল্টন ১৮০০ সালে ভারতের একটা অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ করেন। ডাঃ বুকানন ভারতের বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করে তাঁর তদন্ত-কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই তদন্তের রিপোর্টের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিশ্চয়ই এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

তিনি লিখেছিলেন, মহীশূর প্রদেশের সবন-দুর্গ এলাকার লোহা থেকে নানাপ্রকার চাষ-বাসের যন্ত্রাদি এবং নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত করা হত। বাঙ্গালোর ছিল সেদিন শিল্পবাণিজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এই কেন্দ্রে সুরাট, পুণা

কাশ্মীর ও নিজাম রাজ্য থেকে ব্যবসায়ী কারবারী জমায়েত হতেন। লাক্ষা, নীল প্রভৃতি থেকে প্রস্তুত দেশী রঙে রঞ্জিত সূতী ও পশমের দ্রব্যাদি ছিল স্থানীয় বাজারের উল্লেখযোগ্য পণ্য। সেদিন তাঁত চালান বস্ত্র বুনান সম্মানজনক কাজ বলেই গণ্য হত। সকলস্তরের স্ত্রী পুরুষই এই কাজে নিযুক্ত থাকতেন। হপ্তা-হাটে মেয়েরা ক্রয় করতেন তূলা, বাড়ীতে বসে বুনতেন সেগুলি আর এই বোনা সূতো বিক্রী করতেন তাঁতীদের কাছে। গাব্বী এলাকা ছিল সেদিন দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যকেন্দ্র। এখানে বিক্রীর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসত কম্বল, চটের কাপড়, লোহা ও ইস্পাত। কয়েম্বাটুর জেলায় ৪৫০টির উপর তাঁত চলত। বিহার জেলায় চলত ৭৫০টি তাঁত আর বার্ষিক উৎপাদিত দ্রব্যের মুল্য ছিল ৪৯১৪০০৲ টাকা। তসর বোনা হত ফাতুহা, গয়া, এবং নাবাদায়; আর তার বার্ষিক মূল্য ছিল, ৪২১৭১০৲ টাকা। এই জেলার অন্যান্য শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাগজশিল্প, চর্ম্মশিল্প, লৌহশিল্প, রঞ্জন শিল্প ও রংএর কাজ, কম্বল বোনা এবং মৃৎশিল্প। এই সকল শিল্পের পণ্যগুলিকে নৌকা করে পাটনা ‘থেকে কলিকাতা নিয়ে যাওয়া হ’ত। এই পরিবহনও সেদিন একটি বিশেষ লোভনীয় জীবিকা বলে গণ্য হত।

সাহাবাদ জেলার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল বস্ত্রশিল্প। এখানে বৎসরে যে সূতা তৈয়ারী হত তার মূল্য ছিল, ১৪৫০, ০০০ টাকা। কাঁচাসিল্ক পাঠান হ’ত রতনপুরে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উৎপাদন দ্রব্যের মধ্যে কাগজ, গন্ধদ্রব্য, এবং তেলের নাম করা যেতে পারে। ভাগলপুর জেলায় কুটির শিল্পের তৈরী পণ্য দ্রব্যের মধ্যে তূলার কার্পেট, সতরঞ্জি, কম্বল, জড়োয়া গহনা, লোহার কাজ, মাটির কাজ, এবং চামড়ার কাজ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তসর তূলা মিশ্রিত পোষাক তৈয়ারীতে এখানকার বস্ত্র-শিল্প বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং এই কাজে ৩,২৭৫টি

তাঁত চলত। প্রত্যেক তাঁতির একাজে বছরে দু'টাকার উপর মুনাফা হত। জাহাজ তৈরী শিল্প থেকে সুরু করে শর্করা শিল্প নিয়ে ছিল গোরক্ষপুরের শিল্প। বছরে এখানে প্রায় ৪০০টি জাহাজ ও নৌকা তৈয়ারী হ'ত। কর্ম্মকার তৈরী করত চাষবাসের যন্ত্র আর ছুতোর করত গাড়ী পালকি প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য পরিবহনের উদ্দেশ্যে আর সুবর্ণ বণিক ও কাংসবণিক তৈরী করত সোনার গহনা এবং থালা-বাসন। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারের মত পরিবার জীবন ধারণ করত তাঁত চালিয়ে। বাংলা দেশের দিনাজপুর জেলার খ্যাতি ছিল পশম ও তূলার তৈয়ারী 'মালদহ' বস্ত্রের জন্য। মালদহে ৪০ লক্ষ তাঁত ছিল। সেদিন বড় ঘরের মেয়েদের এবং চাষী মেয়েদের অবসর কালিন কাজ ছিল এই তাঁত চালান। মুসলমান মেয়েরা চিকন কাজ ও মেঝে ঢাকবার ও সাজাবার কাজ করতেন। রং তৈয়ারী করা হত নীল, লাক্ষা প্রভৃতি থেকে। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে সোনার জড়োয়া গহনা চামড়ার কাজ তামা ও লোহার কাজ এবং নীল ও শর্করা শিল্পের নামকরা যেতে পারে। কার্পাস শিল্পে পুর্নিয়া ছিল সেদিন শীর্ষস্থানীয়। প্রতি বর্ষে তৈরী সূতার মূল্য ছিল ১,৩০০,০০০, আর এতে মুনাফা হ'ত তাদের ১ লক্ষ টাকা। ১৩,৫০০টি তাঁত চালু ছিল সেদিন এই জেলাতে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি শিল্পের কথা বলা দরকার। সেই শিল্প হ'ল, নৌশিল্প। ওয়েলেসলি ১৮০০ সালে বলেছিলেন, ভারতে তৈরী ১০০০০ টা জাহাজের ব্যবস্থা ছিল কলকাতা বন্দরে। এই জাহাজগুলি ইংলণ্ডের মাল বহন করে নিয়ে যেত। সেদিনটি হিসাবে বিস্তারে কলকাতা বন্দর পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছেছিল। সেদিন যখন ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বহন করে ভারতে তৈরী জাহাজ লণ্ডনের বন্দরে গিয়ে লাগত, তখন যে চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হ'ত ওদের দেশের জাহাজ শিল্পপতিদের মহলে তা বুঝি নদীতে শত্রু-জাহাজ এলে যে আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ত তাকে ছাপিয়ে যেত। "লণ্ডনের জাহাজ শিল্প এবং এই শিল্প নির্ভরশীল পরিবারদের

মৃত্যু আসন্ন বলে” আন্দোলন তুলেছিল সেদিনের শিল্পপতিরা, রাজনৈতিক ও সরকারী মহলে, ইষ্ঠ-ইণ্ডিয়া কোম্পানীও চুপ করে বসে ছিলেন না। ১৮০১ সালের ২৭শে জানুয়ারীতে ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ ও ভারতীয় নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানালো।*

আঠার শতকের মধ্যভাগ অবধি দেখা গিয়েছে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বণিকগোষ্ঠী হস্ত-চালিত শিল্প, বিলাস দ্রব্য প্রস্তুতের শিল্প, ব্যাপক আভ্যন্তরিণ বাণিজ্য এবং বস্ত্র সূতী, এবং বিলাস দ্রব্যাদির রপ্তানি-বাণিজ্যে তাঁদের মূলধন নিয়োগ করতেন। সতের শতকে কার্পাস দ্রব্য রপ্তানি বাণিজ্যের একটা হিসাব নেওয়া হয়েছিল—তাতে দেখা গেল সতের শতকে সমুদ্রপথে কেবল ভারত থেকেই ৫০০ থেকে ৬০০ লক্ষ বর্গগজ কার্পাস দ্রব্যাদি রপ্তানি করা হয়।

ষোল শতক থেকে সুরু করে আঠার শতকের মধ্যকাল অবধি ভারতের শিল্পগত অবস্থা ও ব্যবস্থার মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া গেল। আর আমাদের আলোচ্য বিষয় বস্তুর পক্ষে এই পরিচয়ই যথেষ্ট।

উল্লিখিত কাল ভারতের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর কাল। রাজা, নবাব, জমিদার, সামন্ত এঁরাই ছিলেন শাসক গোষ্ঠি। রাষ্ট্রীয়-জীবনে এঁরাই ছিলেন সকল বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। উল্লিখিত কালের কিছু পূর্ব্বে থেকেই ক্রমশঃ কুটির শিল্পের প্রসার, প্রতিপত্তি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি এবং ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সৃষ্ট নূতন বণিক সম্প্রদায় আভ্যন্তরিণ ও

*The port of Calcutta contains about 10,000 tons of shipping, built in India. of a description calculeted for the conveyance of cargoes to England ...from the quantity of private tonnage now at command in the port, Calcutta the state of perfection, which the art of ship-building has already attained in Bengal (promising a still more rapid progress and supported by abundant and increasing supplies of timber) it is certain that this port will always be able to furnish tonnage, to whatever extent, may be requried for conveying to the port of London the trade of private British merchants of Bengal. (Cf. Digby).

বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যে বিপুল-বিত্তের অধিকারী হন। ফলে এই বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব গড়ে উঠে। আর এই প্রভাব এই উঠতি বণিক সম্প্রদায়কে উত্তরকালে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-যাত্রায় বিশেষ প্রতিপত্তিশালী করে তুলতে এবং অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ইংরেজ-আগমনের প্রাক্‌কালে এবং তাদের শাসনকালের সুরুতেই বাংলা দেশের জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এবং পশ্চিম ভারতের অর্জ্জুনজী-নাথজীদের চলতি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এঁদের সম্পর্কে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্বে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জগৎশেঠও উমিচাঁদের এবং গুজরাটে অর্জ্জুনজী নাথজীদের প্রভাব সুবিদিত। বাংলা-গুজরাটে যখন বিভিন্ন শক্তি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিযোগিতারত ছিল, তখন ভারতের এই রথচাইল্ডরাই বৃটিশ প্রাধান্যের পথ করে দিয়েছিল। বাস্তবিক, কোম্পানীর ব্যাঙ্কার ও এজেন্ট জগৎশেঠ এবং নাথজীরাই দিল্লীর দরবার ও প্রাদেশিক সরকারে কোম্পানীর প্রভাবের জন্য দায়ী ছিলেন।

বৃটিশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল বণিক-কোম্পানী ভারতে এসেছিল, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সেদিন, এদেশের কুটির শিল্পের পণ্য-দ্রব্যাদি অল্পমূল্যে ক্রয় করে বিদেশে চড়া হারে বিক্রয় করা এবং বিদেশের পণ্য এদেশে আমদানী করে চড়া মূল্যে বিক্রয় করে মুনাফা করা। এই কাজে সেদিন দেশীয় শেঠজীদের সাহায্য অপরিহার্য্য ছিল। শুধু তাই নয় এও তাঁরা বুঝেছিলেন, সরকারী শাসন ব্যবস্থায় প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকলে তাদের আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যে এবং আভ্যন্তরিক ব্যবসায় লাভজনক হয় না, সরকারের প্রবর্ত্তিত কড়া হারে শুল্কের প্রতিবন্ধকতায়। এই সব নানা কারণে সেদিনের সরকারী মহলে ও শাসন ব্যবস্থায় প্রভাব প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা সুরু হয় সেদিনের উঠতি দেশীয় ধনী বণিক শেঠ চেট্টি নাথজীদের সাহায্যে। অবশ্য এই

প্রভাব প্রতিপত্তির কাজে কোম্পানী বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন নবাবের বিশ্বস্ত কয়েকজন ভূস্বামীর কাছ থেকে। মীরজাফরের নাম এদের মধ্যে সহজেই উল্লেখযোগ্য। ভূস্বামীদের দল সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন, শুধু জমিদারীতে অর্থ করবার দিন শেষ হয়ে এসেছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে মনোনিবেশ না করলে উঠতি ধনী বণিক শেঠ সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিযোগিতায় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ; আর যার পরিণতি হবে, রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় নবাবের আনুকুল্যে যে প্রভাব ছিল নূতন শক্তির আবির্ভাবে তা থেকে বঞ্চিত হওয়া। রাজা, নবাব, জমিদারের কাল বিগতপ্রায় এবং উঠতি মধ্যবিত্ত বণিক শেঠ শিল্পপতিদের যুগ আসন্ন—এ তাঁরা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সকলেই উপলব্ধি করে ছিলেন।

নূতন সূর্য্যের আবির্ভাবের ইঙ্গিত শেঠনাথজী উভয় পরিবারেরই উপলব্ধি করবার দূরদৃষ্টি এবং প্রতিভা ছিল। শতকের মাঝামাঝি কাল থেকেই শেঠরা বৃটিশদের সমর্থক হয়ে পড়েছিল এবং নাথ-জীরাও ইংরেজ বণিকদের ঘনিষ্ঠ হতে আরম্ভ করে। আবার, জগৎশেঠ, নাথজী, রামজী অথবা ঠাকুররাও বিদেশী কোম্পানীর দিকে ঝুঁকে ছিলেন কারণ এই কোম্পানীই সেদিন শান্তি, প্রগতি প্রাচুর্য্যের উৎস ছিল ব'লে উপলব্ধি করেছিলেন।

তাই শেষকালে এই বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের সাথে যোগসা-জসে চক্রান্ত করে নবাবকে গদিচ্যুত করবার চেষ্টা করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি। সেদিনের অর্থনৈতিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবনের নেতৃস্থানীয় যাঁরা—তাঁরা বুঝেছিলেন, নূতন অর্থনৈতিক শক্তির জোয়ারের প্রবল আঘাত সুরু হয়েছে, সেদিনের চলতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর কুলে কুলে। ভাঙ্গন সুরু হওয়াই স্বাভাবিক। হ'লও তাই।

কিন্তু এই ভাঙ্গন ও পরবর্ত্তী গঠনের কাজ সুরু ও সমাপ্ত হয় অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে। এই ভাঙ্গনের নেতৃত্ব ইতিহাসের নির্দ্দেশে যে ক্ষেত্রে থাকা উচিত ছিল দেশীয় বণিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে

সে ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের দুর্ব্বলতা, অসংঘবদ্ধতা অসচেতনতার সুযোগে নেতৃত্ব গিয়ে পড়ে অধিকতর শক্তিশালী, শ্রেণী-স্বার্থ-সচেতন অভিজ্ঞ বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের হাতে। তাই বিদেশী নেতৃত্ব স্বকীয় স্বার্থে আঘাত লাগবার সম্ভাবনার আশঙ্কায় এই ভাঙ্গনের কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই চলতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র ক্ষমতাকে করায়ত্ত করার কাজে মন দেয়। ফলে বিদেশীর স্বার্থে সেদিন দেশীয় স্বার্থের দিক দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হ'ল।

বিদেশী বণিক কোম্পানী রাষ্ট্র ক্ষমতার সাহায্যে প্রথমেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করলেন। এই উদ্দেশ্যে সর্ব্ব প্রথম যে সকল আইন, শুল্ক, বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করলেন, সেগুলি নির্মূল করার কাজে তাঁরা হাত দিলেন।

রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার

১৮শতকে বাংলা দেশে আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের জন্যে এক ধরণের Transit Duties প্রচলিত ছিল। সেই শুল্ক বাণিজ্যিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে বোধ হওয়ায় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রাজকীয় ফরমানের সাহায্যে এই শুল্কের হাত থেকে কোম্পানীর ব্যবসায় বাণিজ্যকে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। P. R. Ramchandra Rao তাঁর Decay of Indian Industries বইতে লিখেছেন, কোম্পানীর পণ্য 'দস্তক' (বৃটিশ ফ্যাক্টর প্রধানদের সই করা পাশ) দেখিয়ে শুল্ক দেওয়ার দায় থেকে রেহাই পেত। বাংলার নবাবরা সেদিন বহির্বানিজ্যের ক্ষেত্রে এই সুযোগ দিয়েছিলেন কিন্তু কোম্পানী এই সুযোগ আভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের বেলাতেও গ্রহণ করেছিল। ফলে যদিও স্থানীয় বাণিজ্যের বেলাতে এই

'দস্তক' ব্যবহার চলবে না বলেই নিয়ম ছিল,কিন্তু কোম্পানীর এজেন্টকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ব্যাপকভাবে 'দস্তকে'র অপব্যবহার করেছে।*

কোম্পানী ক্রমশঃ আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য ছাড়া দেশের আভ্যন্তরিক ব্যবসায় বাণিজ্যও আরম্ভ করেন। তাই তাদের সুবিধার জন্য ইংরেজ পতাকাবাহী ফৌজ নৌকা বা জাহাজ আটক করবার অধিকার থেকে নবাবের কর্ম্মচারীদের বঞ্চিত করবার ব্যবস্থা হল। এই প্রকারে আইন ও বলের সাহায্যে কোম্পানী এদেশের বাজার দখলের ব্যাপারে জাতীয় বণিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় নানারূপ অন্যায় সুযোগ ভোগ করতে সুরু করল। কোম্পানীকে বা বৃটিশ বণিককে যেখানে তাদের পণ্যের জন্য এক কপর্দক Transit শুল্ক দিতে হত না সেক্ষেত্রে ভারতীয় বণিকদের পণ্যের উপর চাপান হত কড়াহারে এই শুল্ক। এই রকম নানা প্রকারে দেশীয় বণিকদের বাজার নষ্ট করে আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ও রাজস্বের উপর কোম্পানী ও বিলিতি বণিকদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ হল। আর এই বিনা শুল্কে ব্যবসা চালাবার জন্য সেদিন এঁরা অত্যাচার, জুলুম করতেও দ্বিধা করেন নি। সেদিনের বাংলার নবাব মীরকাশিম তদানীন্তন গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্টের কাছে এই বলে কঠোর অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর রাজ্যের সকল জেলায় তাঁর শাসন-ব্যবস্থা একেবারে অচল হয়ে পড়েছে বড় বড় ইংরেজ কর্ম্মচারী, গোমস্তা ও এজেন্টদের কার্য্যকলাপে; তিনি একথাও জানিয়েছিলেন, এই সকল কর্ম্মচারীরা নিজেরাই Collectors, Renters, জমিদার ও তালুকদার হিসাবে কাজ করে নবাবের

*The Company's goods escaped toll free on the production of a "dastak", free pass signed by the English Presidents or by the head of the English factories. The Nawabs of Bengal has conceded this privilege but the company extended the claim in respect of their private internal trade. The 'dastak's which had never been designed to cover the local trade of Bengal was grossly abused on a wholesale scale by the agents of the Company.

শাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে চলত। পরবর্ত্তী কালের গভর্ণর Henry Verlest যে সকল অত্যাচার জুলুমের কথা লিখেছেন তার মধ্যে বাংলার নবাবের লেখা এক পত্র থেকে উদ্ধৃত নিম্নরূপ বর্ণনাও পাওয়া যায়ঃ কোম্পানীর গোমস্থারা পণ্যের এক চতুর্থাংশ মূল্যের বিনিময়ে রায়ত ও বণিকদের কাছ থেকে ফসল পণ্যাদি জোর করে কেড়ে নিয়ে যেত। আবার নিজেদের একটাকা মূল্যের পণ্য রায়তদের কাছে জুলুম জবরদস্তি করে ৫৲ টাকায় বিক্রি করত। এই অত্যাচার জুলুমের ফলে এবং আমিও ("নবাব") শুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে বার্ষিক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা আমার ক্ষতি হয়। (রমেশচন্দ্র দত্তের বই থেকে উদ্ধৃত)*।

কোম্পানীর অধীনস্থ বণিক উইলিয়ম বোল্টের ঐতিহাসিক সাক্ষের কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। তিনি লিখেছেন, একথা সম্পূর্ণ সত্য দেশের মোট আভ্যন্তরিক বাণিজ্য এবং য়ুরোপের জন্য কোম্পানীর নিয়োজিত মূলধন পরিচালনার ব্যাপার নিছক অত্যাচার জুলুমের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কুফল প্রত্যেকটি দেশীয় তাঁতী, কারিগর সম্প্রদায় ভোগ করে, যখন কোম্পানী সকল পণ্যকে তাঁদের একচেটিয়া অধিকারে আনবার চেষ্টা করে। তিনি আরও বলেছেন,...ইংরেজরা সেদিন বেনিয়ান এবং কালো চামড়ার গোমস্তাদের সাহায্যে নিজেদের খুশীমত কি পরিমাণ পণ্য কারিগররা (manufacturer) তৈয়ারী করবে এবং বিনিময়ে কতমূল্য তারা পাবে সে সম্পর্কে তারা স্থির করবে।*

*They (The Company's Gomasthay) gorcibly take away the goods and commodities of the Riats, Merchants etc. for a fourth part of their value ; and by way of violence and oppression the oblige the riats etc, to give five rupees for goods which are worth but one rupee......*so* that by means of these oppression and I being deprived of my duties suffer a yearly loss of nearly twenty five lakhs of rupees. (Ramesh Chandra dutt)

*The English with their BANYANS and black GOMASTHAS arbitraily decide what quantities of goods each manufacturer shall deliver and the prices he shall receive for them. (P.—191) 1

তিনি আরও লিখেছেন, অমানুষিক অত্যাচার ও জুলুম সেদিন উৎপাদনকারী ও কারিকর-তাঁতিদের একমাত্র পাওনা ছিল। বাস্তবিক পক্ষে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এদের সঙ্গে দাস শ্রেণীর মত ব্যবহার করত। এর স্বাভাবিক ফল হিসাবে পণ্যের অভাব, মহার্ঘতা এবং উৎপাদনের বিকৃতি ঘটে। ফলে পরিণামে রাজস্ব আদায়ের পরিমান হ্রাস পেতে থাকল। (ch. Ramsay Davies)

কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে মত-দ্বৈধ ও বিরোধ ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই বিরোধের প্রকাশ ঘটে যখন পরিচালক বর্গের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অত্যাচার জুলুমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিমত দিতে লাগলেন এবং নিন্দা করতে লাগলেন। ক্রমশঃ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে ; তাই এখন আগের কথাতেই ফেরা যাক।

বণিক পুঁজি ও শিল্প পুঁজির দ্বন্দ্ব—নূতন নীতি

Regulation XXXI of 1793 অনুযায়ী ব্যবস্থা হল, যে তন্তুবায় কোম্পানীর কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ সাহায্য পাবে, সে কোন প্রকারেই তার শ্রম বা উৎপাদন কোম্পানী ছাড়া অপর কাউকেই দিতে পারবে না। যদি সে এই নির্দ্দেশের অন্যথা করে তবে তাকে দেওয়ানী আদালতে সোপার্দ্দ করা হবে। আর যদি কোন তন্তুবায় একটির বেশী তাঁত চালায় বা শিল্পে একজনের বেশী কারিগর নিয়োগ করে তবে, চুক্তি অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ না দিতে পারলে, বস্ত্র প্রতি খরচের মূল্যের শতকরা ৩৫% ভাগ জরিমানা হিসেবে দিতে হবে।*

*He shall be subject to a penalty of 35 percent on the stipulated price of every piece of cloth that they may fail to deliver according to the written agreement.

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর পুঁথিতে লিখেছেন কোম্পানী ও তার কর্মচারী এই নিয়ন্ত্রণের নামে তন্তুবায় কারিগর সম্প্রদায়ের উপর অমানুষিক অত্যাচার করত। (যেমন, জোর ক'রে তাঁতীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া; পণ্যের সরবরাহ্ ত্বরান্বিত করার জন্য জরিমানা করা, যন্ত্রপাতি কেড়ে নেওয়া প্রভৃতি নানারকম জুলুম করা হত)।

হতভাগ্য তন্তুবায় সম্প্রদায় এই জঘন্য মারাত্মক দায় থেকে খুব অল্পই রেহাই পেত; ফলে শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কেনা দাসে পরিণত হ'ত। সেদিনের লণ্ডনের বণিক ও শিল্পপতি সম্প্রদায় এ সম্পর্কে খুব খোলাখুলিই বলেছিলেন, যতদিন না এই ৩নং রেগুলেসান তুলে নেওয়া হচ্ছে ততদিন কোম্পানী তার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাধ মুনাফা লুটবার জন্য। তাঁরা আরও বলেছেন, এর দ্বারা কোন ব্যক্তি কোম্পানীর কাছে ঋণী থাকলে কোম্পানীর চাকরী থেকে কস্মিন্‌কালেও রেহাই পেত না, শুধু তাই না, তারা নিজের বা পরের আর কারও কাজও করতে পারত না।*

এই মৌখিক ভালমানুষির পেছনে যে গাত্রদাহ ফুটে বেরিয়েছে তার মূলে রয়েছে উভয়ের পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত। লণ্ডনে উঠ্‌তি শিল্পপতি বণিক সম্প্রদায়ের বিরোধ অর্থাৎ নূতন শিল্প পুঁজির সাথে পুরাতন বণিক পুঁজির বিরোধ বাজার দখল নিয়ে।

কোম্পানীর কর্মচারীদের এই জুলুমবাজ নীতি ও কার্য্যকলাপে কোম্পানীর পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের অনেকেই সমর্থন জানাননি—একথাও আগেই বলেছি। তাঁরা একথা উপলব্ধি করেছিলেন, এই অত্যাচার ও জুলুমবাজ নীতির সাহায্যে এদেশের শিল্পকে একেবারেই ধ্বংস করলে দেশের অর্থনৈতিক অবনতি

*By it no persons in balance to the company or engaged in any way in the provision of their investment, can withdraw from their employ, they can not work for others or for themselvs (Major D. Basu)

ঘটবে যার ফলে রাজস্ব হ্রাস পেতে থাকবে। বিলিতি বণিক উইলিয়ম কেণ্ট সাহেবের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করি, তাঁতিদের উপর বিভিন্ন ধরণের ও অসংখ্য রকমের অত্যাচার কোম্পানীর এজেণ্ট গোমস্তারা করতেন। যার স্বাভাবিক ফল হয়েছে পণ্যের দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্যতা, ও পণ্যের নিকৃষ্টতা এবং সাথে সাথে রাজস্বের ব্যাপক হ্রাস।

হেনরী ভ্যানসিটার্টের কাছে ওয়ারেন হেষ্টিংসের লেখা এক পত্রে এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন, আমি আপনার সম্মুখে কতকগুলি অভিযোগ রাখছি যেগুলির সমাধান হওয়া আশু প্রয়োজন। ইংরেজের নামে এবং নবাবের প্রজাদের প্রতিরোধের ক্ষমতার অভাবের ফলে যে অত্যাচার জুলুম চলছে তার কথাই আমি বলতে চাইছি।†

ভ্যানাসটার্ট, হ্যারি ভারলেষ্ট (পরবর্ত্তী বাংলার গবর্ণর) প্রত্যেকেই এই অত্যাচার জুলুমের এক বাক্যে নিন্দা করেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গও তাঁদের কর্ম্মচারীদের এই ধরণের অন্যায় অত্যাচারের নিন্দা করেছেন। কিন্তু বিশেষ ফলপ্রসু হয়নি। P. R. Ram Chandra Rao তাঁর Deacay of Indian Industries পুঁথিতে লিখেছেন, একদিকে অত্যাচার জুলুম অপর দিকে একচেটিয়া ক্ষমতা ব্যবহারের যুগ্ম পথ থেকে সরিয়ে আনবার জন্য তাঁদের নির্দেশের কোন ফলই হয় নি।‡

*Various and innumerable are the methods of oppressing the poor weavers, which are duly practiced by the company's agents and Gomasthas in the country......The natural consequence of which have been, the scarcity, dearness, and debasement of the manufactures as well as a grant diminution of revenues.

† I beg to lay before you a grievance which calls loudly forredress... I mean the oppressions committed under the sanction of the English name and through the want of spirit in the Nawab's subjects to oppose them.

‡ Their instructions availed little indeed in weaning their functionaries from the double path of monopoly and oppressions.

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন,* ইংরেজ বণিক-কোম্পানী এদেশে এসেছিলেন সেদিন বাণিজ্য করতে এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যের উপর সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ছিলেন। এদেশীয় শিল্পকে একেবারে ধ্বংস করা তাদের প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু কালের গতির সাথে সাথে ইতিহাসের নির্দ্দেশে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন ও শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে এই বণিকবাদেরও (British Mercantalism বা commercial capitalism—কৃষিযুগীয় অর্থনীতি থেকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রসারলাভের মধ্যবর্ত্তী স্তর) দিন ঘনিয়ে এল। বৃটেনের অর্থনৈতিক কাঠামোতে আর আমাদের দেশের তৈরী পণ্যের প্রয়োজন ছিল না। সেদিন প্রয়োজন ছিল তাদের, আমাদেব দেশের কাঁচা মালের, তাদের এই শিল্প-বিপ্লব সৃষ্ট নূতন অর্থনৈতিক বনিয়াদকে শক্তিশালী এবং পূর্ণতায় সার্থক করার কাজে রসদ হিসাবে। তাই দেখি কোম্পানীর ডাইরেক্টরেট তাদের কর্ম্মচারীদের জুলুম অত্যাচারের মৌখিক নিন্দা করলেও পরবর্ত্তিকালে ওদের দেশের নূতন অর্থনৈতিক শক্তির চাহিদা মেটাতে দ্বিধা করেন নি। পলাশীযুদ্ধের পূর্বে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে রেশম ও রেশম বস্ত্র রপ্তানি করা হত ইংলণ্ডে। এর ফলে সে দেশের তন্তুবায় সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্তও হ'ত বিশেষভাবে। তাই পলাশী যুদ্ধের ফলে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ হ'ল সেই ক্ষমতাকে এদেশের উন্নত ধরণের কুটীর শিল্পকে জোর করে ধ্বংস করে তাদের দেশের নূতন যন্ত্রশিল্পযুগীয় ধনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনকে

*"Imagine how black must have been their deeds, when even the Director of the company admitted that, the vast fortunes acqired in the inland trade have been obtained by a scene of the most tyrannical and oppressive conduct that was ever known in any age or country. Concieve the atrocious state of society described by Vansittirt who tells us that the English compelled the natives to buy or sell at just what rates they pleased on pain of flogging or confinement." —Dr. Herbert Spancer.

সার্থক করার কাজে নিয়োগ করা হল। বৃটিশ রেশম-শিল্পকে যে কোন প্রকারেই হোক রক্ষা করতে হবে, এতে যদি বাংলার শিল্প ধ্বংসও হয়—তাতে কোন ক্ষতি নেই। ১৭৫৯ সালে ১৭ই মার্চ্চে কোম্পানী বাংলাদেশের প্রতি তার নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে কাঁচা রেশম উৎপাদনের ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য করা হবে কিন্তু তা থেকে এদেশে পণ্য তৈরীর কাজে সম্পূর্ণ বাধা দেওয়া হবে। তাছাড়া, রেশম-কর্ম্মীদের নিজেদের বাসায় কাজ করতে নিষিদ্ধ করা হয় এবং কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে তারা নাম লিখিয়ে আসতে বাধ্য থাকবে।

এই ছিল সেদিনের নূতন নীতি। সকল শিল্পের বেলাতেই এই নীতি অনুসৃত হত। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কমন্সসভায় Administration of Justice in India সম্পর্কে যে Select Committee গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছিলেন, এই চিঠিতে একটা নির্ভুল পরিকল্পনার কথা আছে যার ফল বাংলার শিল্পের পক্ষে অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষতিকর হ'বে শিল্প প্রধান একটা দেশের (Industrial Country) সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্প কারখানার কাঁচামাল যোগাবার ক্ষেত্রে পরিণত করাই এই নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল হবে।*

১৮১৩ ও ১৮৩৩ এর চার্টার

১৮১৩ সালে চার্টার আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার অধিকারের অবসান ঘটল এবং যে কোন বৃটিশ নাগরিক ভারতে ব্যবসায়-বাণিজ্য করবার এবং ভূমি ক্রয় করবার অধিকার

*"This letter contains a perfect plan of policy both of compulsion and encouragement which must in a very considerable degree operate destructively to the manufactures of Bengal. Its effect must be to change the whole face of that industrial country in order to render it a field of the product of crude materials subservient to the manufactures of Great Britain."

প্রতিষ্ঠিত হল। এরপর থেকে বেসরকারী বৃটিশ বণিক সম্প্রদায় বিশেষ লাইসেন্সের অধীনে বৃটেনজাত পণ্যদ্রব্য ভারতের বাজারে চালু করবার অধিকার পেল। এ' অধিকার ১৮১৩ চার্টারের পূর্ব্বে এদের ছিল না; অপর দিকে, কোম্পানীর রাজস্বের পরিমাণের দিক দিয়ে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে। কিন্তু সে ভয়, সে শঙ্কা ত' এই বেসরকারী দায়ীত্ববিহীন, বণিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ছিল না। তাই ১৯ শতকের প্রথম দিকেই এই বেসরকারী বণিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এই দেশে অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের লক্ষণ দেখা দিল। যদিও এখবরও আমরা পাই, যে, ১৯ শতকের প্রারম্ভেও ইংলণ্ডে ভারতীয় কার্পাস ও পশমের দ্রব্যাদি অত্যাধিক পরিমাণেই রপ্তানি করা হ'ত, যার মূল্য সেদিন হিসাব করে দেখা গিয়েছিল, ২৫ লাখ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ বস্ত্র-শিল্পের বাজারের ক্রমোন্নতির একটা পরিষ্কার লক্ষণ দেখা দিল। আর ঠিক এই কারণেই, ইংলণ্ডের নূতন আবিষ্কৃত শক্তি ও যন্ত্র চালিত তাঁতের দ্রব্যকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করবার পথ করা হ'ল এদেশে আইনের মাধ্যমে চড়া হারে রপ্তানি শুল্ক এবং ওদের দেশে ভারতীয় পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক বসিয়ে। এই আলোচনা পূর্ব্বেই করা হয়েছে; এ ছাড়াও এদেশে ইতিমধ্যে বিলেতি বণিক সভা গড়ে তোলা হ'ল, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতায় ১৮৩৪—৩৬ সালের মধ্যে। এদেশে বৃটিশ বস্ত্র-শিল্পের বাজার প্রসারের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের জীবন-যাত্রা ও রুচিবৃত্তির খোঁজ নেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল এই সব বণিক সভাগুলির। (Collecting information about the customs and tastes of the Indian people in order to push British Textile goods.)। ফলে দেশী ও বিদেশী উভয় বাজারেই ভারতীয় তাঁত শিল্পের হাতছাড়া হ'ল।*

* The former was lost due to prohibitory and sumptuary Laws against the use of printed Indian calicos in England that were being enacted since 1701

যাইহোক ১৮১৩ সালের চার্টারে ভারতে বৃটীশ নাগরিক বিশেষ লাইসেন্সের অধীনে ব্যবসায় বাণিজ্য করবার যে স্বল্প ক্ষমতা পেয়েছিল, ১৮৩৩ এর চার্টারে সে অধিকার আরও প্রসারিত ও বন্ধন -মুক্ত করা হল। ১৮৩২ সালের চার্টারে কোম্পানীর অধিকার ও ক্ষমতাকে আরও খর্ব্ব করা হ'ল এবং ব্রিটীশ নাগরিকদের ভারতে অনুপ্রবেশ ও ব্যবসায় বাণিজ্য করবার জন্য Special Licence-এর সর্ত্ত তুলে দিয়ে এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য চালাবার নিরঙ্কুশ ও পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল। ১৮৩৩ এর চার্টারে বলা হয়েছে, The company was entirely shorn of "the right to trade for their own benefit in common with other His Majesty's subjects". চার্টারে আরও বলা হ'ল, ইংলণ্ডের যে কোন স্বাভাবিক নাগরিকের (natural born citizen) পক্ষে সমুদ্রপথে ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের যে কোন স্থানে বিনা লাইসেন্সে বসবাস করা, জমি ক্রয় ও ভোগ করা এবং এইরূপ বসবাসের সাহায্যে কোন মুনাফা সংগ্রহ, সম্ভব হলে তা ভোগ করা আইন সম্মত হবে। (clauses—81-86)

এত গেল আইনগত অধিকারের কথা। কথা উঠবে সেদিন এই চার্টার আইনগুলির পাশ করবার অর্থাৎ কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রাধান্যের অবসান ঘটাবার প্রচেষ্টার এমন কি কারণ এল? এসম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই পেয়েছি, এবার বিশদ আলোচনা করা যাক্।

and 1720, while in India the competition with British machine goods, the destruction of Indian shipping, the examption of the British Merchants from the payment of customs duties, transit duties, and the establishment of British monopoly in the Indian cloth trade virtually destroyed the handicrafts. At the same time, the merchant class was hard hit by the differential trade monopoly and extraordinary privileges at home in favour of the European and especially English merchants and factories, "as if they were even more than the natives".

— Dr. Radha Kamal Mukherjee.

১৯ শতকের সুরুতে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের জের হিসাবে নেপলিয়ন কণ্টিনেণ্টের বন্দরগুলিতে বৃটিশ বাণিজ্যিক পণ্য আমদানী বন্ধ করে দিলেন—ফলে বৃটিশ বহির্বাণিজ্যে সংকট ঘনিয়ে এল এবং তখন বৃটিশ বণিকদের পক্ষ থেকে তাদের পণ্যের নূতন বাজারের জন্য সরকারের কাছে দাবী করা হল। আর এই নিয়ে অবিলম্বে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী মহলে আন্দোলনও সুরু হ'ল। তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হ'ল সেদিন ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনহেতু বিদেশে বাজার, এবং যন্ত্রশিল্পের জন্য উপযোগী কাঁচামালের জন্য উপনিবেশ স্থাপনেব চাহিদা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ওদেশের উঠতি মধ্যবিত্ত শিল্পপতিরা শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও পণ্যের বাজারের জন্য আন্দোলন সুরু করলেন।

আবার ১৭-১৮ শতকে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের কার্য্যক্রম ও জুলুমবাজ নীতির ফলে ভারতীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসের সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিতে জন-সংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং ১৮১৩ সালে বোম্বাইতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বাংলায় ও মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যেতে লাগল। এই অবস্থায় লোকের ক্রয়ক্ষমতা দিনে দিনে হ্রাস পেতে থাকে। ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল দেশীয় শিল্প-ব্যবসায় বাণিজ্যে—যা তখনও অবশিষ্ট ছিল। জমিতেও ক্রমবর্দ্ধমান জনসমষ্টির চাপের ফলে উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকল। বিলিতি বণিক সমিতিগুলি এ সকল খবরও দেশের শিল্প-পতিদের কর্ণগোচর করলেন। ইংরেজ-শিল্পপতি-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে কসুর করলেন না। তাঁরা ভাবলেন এই সংকটকালে যন্ত্রে তৈরী সস্তা পণ্য দ্রব্য ভারতের বাজারে ছাড়তে পারলে শীঘ্রই বাজার দখল করা কঠিন হবে না। কিন্তু তাঁদের এ আশা অবশ্য সম্পূর্ণ বাস্তব সম্মত হয়ে উঠতে পারেনি। সেদিন কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে এক প্রশ্নপত্র মারফৎ জানতে চেয়েছিলেন,

ভারতীয় জীবন-যাত্রা ও আচার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কি বলতে পারেন, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে য়ুরোপীয় পণ্য-দ্রব্যাদির চাহিদা হবে কি না? ওয়ারেন হেষ্টিংস উত্তরে লিখেছিলেন, আজকের এই দরিদ্র ভারতীয়দের অভাব বলে সঠিক কোন বোধ নেই। তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়তা মাথার উপর একটা কোন রকনের ছাউনি, খাদ্য এবং সামান্য পোষাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যা তারা নিজের দেশেই পেয়ে থাকে। স্যার জর্জ ম্যালিকম (তৎকালীন বোম্বাইয়ের গভর্ণর) বলেছিলেন, তিনি মনেই করেন না, ভারতীয়েরা য়ুরোপীয় পণ্যের ক্রেতা হতে পারে—যদিও বা তারা তাদের সাদাসিদে জীবন যাত্রার জন্য য়ুরোপীয় পণ্যের প্রয়োজন বোধ করে, ক্রয় ক্ষমতার অভাবের দরুণ তাও সম্ভব হবে না। টমাস মুন্‌র লিখেছিলেন, ভারতীয়দের বস্ত্র পোশাকাদি তাদের দেশেই তৈরী হ'ত। আমাদের যোগান দিয়ে লাভ নেই, কেননা, তারা ("ভারতীয়েরা"-লেখকের) নিজের দেশেই উৎকৃষ্ট অথচ সস্তায় তা পেতে পারে। কাজেই তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামা অযৌক্তিক।*

আবার ভারতে" তাদের পশমী দ্রব্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোম্পানীর ডাইরেকটরদের সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ভারতীয়দের নিজেদেরই মোটা পশমীবস্ত্র আছে যাতে তাদের সব প্রয়োজনই ইংলণ্ডের পণ্যের চেয়ে অনেক ভালভাবেই মেটে।†

দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই ধরণের রিপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার বৃটিশ-শিল্পজাত দ্রব্যকে আইন, শুল্ক ও বলের সাহায্যে কি প্রকারে এই দেশের বাজারে

---

* The clothing of the Indian is all the manufacture of his own country We can not supply him because, while he can get it not only better but cheaper, at home, it is impossible that we can enter in to competition in the market.

† The natives have already coarse woollens of their own which answer all the purposes for which they require them better than those of England do.

চালু করার ও বাজার দখলের চেষ্টা করেছিলেন সে আলোচনা আগেই করেছি।

আপাততঃ এই টুকু বোঝা গেল, ভারতকে বৃটেনের শিল্পজাত-দ্রব্যের বাজার ও তার শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করবার তাগিদ থেকেই কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রাধান্যের অবসান ঘটাবার চার্টার আইন প্রবর্ত্তনের তাগিদ এল। কর্ণওয়ালিশের ভূমি নীতির উদ্ভব ত' এই তাগিদ থেকেই। বৃটেনের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সফল করতে গিয়ে ভারতের অর্থনীতিকে তাঁরা আইন, শুল্ক, জোরজুলুম—ভূমি নীতির অক্টো-পাশে বাঁধলো।

ওদের দেশে নূতন উৎপাদন পদ্ধতির ফলে নূতন অর্থ নৈতিক যুগ সুরু হয়েছে ; তাই যারা এই সব উৎপাদন শক্তির মালিক এই নূতন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার প্রতিভূ তারাই সেদিন আইন-কানুন রাষ্ট্রীয় ব্যাপাবে সর্বে-সর্বা—তাদের নির্দ্দেশেই আইন তৈয়ারী হয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো বদলায়। পুরাতন দিনের বণিক সম্প্রদায়ের তাদের প্রাচীন Commercial Capitalism বণিকবৃত্তিবাদের অথনীতি নিয়ে এই ইতিহাস নির্দ্দেশিত পরিবর্ত্তনকে রুখ্‌বার শক্তি বা সাহস কোথায়? এ ছাড়াও কোম্পানীর এদেশে আগমনের কিছুকালের মধ্যেই পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ক্রমশই যখন গোটাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা হতে থাকলো তখন অবিলম্বে এদেশে রাজা হয়ে বসবার উপক্রমই কোম্পানী করল, বণিক বৃত্তি প্রায় ত্যাগ করেই। অর্থাৎ বণিক কোম্পানী দেশ জয়ের পরে ক্রমশঃ অধিকতর রাজস্বের দিকে নজর দিতে থাকে, ফলে কোম্পানীর ব্যবসায়ের দিকটা অল্প বিস্তর অবজ্ঞাত হতে থাকে। প্রসঙ্গান্তরে পূর্বে বলা হয়েছে, ১৮ শতকের মাঝামাঝি দিক থেকে কোম্পানীর এদেশীয় ডিরেক্টরবর্গের অনেকেই কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের এদেশীয় কারিগর শিল্পীদের উপর অত্যাচার জুলুমের এবং শিল্পকে একেবারে ধ্বংস

করবার নীতির প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—তাগিদ ছিল রাজস্বের। মনে হয় সামন্তযুগীয় ঝোঁক আবার কোম্পানীর ঘাড়ে চেপে বসেছিল। একথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মনে হয় কোম্পানীর ভারতের কর্ত্তাদের এই ধরণের মতি গতি দেখে, ১৮১৩ সালের চার্টারে ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্য প্রসারের জন্য ভারতীয় বাজার দখলের চেষ্টায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল চার্টার অনুমোদিত বেসরকারী ইংরেজ বণিকদের, কোম্পানীর বা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নয়। এখানে একটি সংবাদ উল্লেখ করলে বিরোধের রূপটা আরও পরিষ্কার হয়। সংবাদটী হল, ১৯ শতকেব একেবারে গোড়ার দিকে কোম্পানী বিলেত-জাত কোন দ্রব্যই ভারতে আমদানী করেনি। কিন্তু তখন আর সময় ছিলনা। ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ এব ধাক্কায় কোম্পানী একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ল। অবশ্য সময় লেগেছিল। বেসরকারী ইংরেজ বণিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যারা ১৩ এর চার্টারের ব্যবস্থায় এদেশে নূতন এল, তারা তাদের উপর ন্যস্ত কর্ত্তব্য ব্যবসায় বাণিজ্যে বাজার দখলে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। নির্ম্মল চন্দ্র সিংহ লিখেছেন, তারা (কোম্পানী) যুদ্ধ, কূটনীতি ও অভিযানের সাহায্যে তাদের জীবিকা অর্জ্জন করছিল। প্রাথমিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের বৃত্তি তাদের কাছে প্রায় শ্বেত হস্তী পোষার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।* প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন পুরাতন বাণিজ্যিক সংস্থার অস্তিত্বই বহুসংখ্যক বাণক ও বণিক-প্রতিষ্ঠানের দূরে হটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এ ছাড়া, এই সংবাদও আমরা পাই, এই সকল বেসরকারী বণিক সম্প্রদায়ের কাজে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অহেতুক

* 'It was earning its livlihood by wars and diplomacy and conquest. Its original occupation of commerce was proving a white elephant.' (Indo-British Economy hundred years ago).

হস্তক্ষেপ ও অসুবিধা সৃষ্টির অভিযোগও সেদিন কোম্পানীর বিরুদ্ধে করা হয়েছিল। তাই ওদের দেশের নুতন অর্থনৈতিক শক্তির নেতৃস্থানীয়েরা প্রয়োজন অনুভব করলেন, বিগত অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিভূ কোম্পানীর ঘনিয়ে আসা বণিকবৃত্তিবাদের অবসান ঘটানো। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নূতন অর্থনৈতিক শক্তির ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। তৈরী হল, ১৮৩৩ এর চার্টার। এই চার্টার অনুযায়ী যে কোন natural born ইংরেজ নাগরিকের ভারতে প্রবেশাধিকার সকলপ্রকার লাইসেন্স ধারা বিমুক্ত হল। মুক্ত প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তা না হলে কোনপ্রকার বাধা-নিষেধ সেদিনের নূতন অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক বিকাশের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় ও সহায়কারী নব-আবিষ্কৃত রাষ্ট্রীয় নীতি Laissez fair ব্যর্থ হত। বৃটেনের কারখানার জন্য কাঁচামাল প্রয়োজন আর তৈরী মালের জন্য বাজার। এই চাহিদা মেটাবার জন্য উন্নত ধরণের চাষ-বাসের ব্যবস্থা এবং ক্রয়-বিক্রয়াদির সুবিধা-জনক ব্যবস্থা কোম্পানীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতেও ত' ছেড়ে দেওয়া চলে না। তাই ১৮১৩-এর চার্টারের আরোপ্ত বাধা নিষেধের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হয় ইংল্যাণ্ডে। নূতন অর্থনীতির প্রয়োজনে ধনতান্ত্রিক দেশের স্বার্থে এই "স্বাধীন ব্যবসায়" নীতির অনুকরণ সুরু হল—সূচনা ১৮৩৩-এ। আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ নীতির সাহায্যে গোটা পৃথিবীর শিল্প ও ব্যবসায়কে একটি মাত্র সমবায় শিল্প সংগঠনে পরিণত করার নীতির প্রচার গাইতে সুরু করলেন নূতন অর্থনৈতিক সংগঠন সৃষ্ট ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্‌দের Manchester-গোষ্ঠি। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হল ভারত কৃষি-শিল্পের দেশ আর ইংল্যাণ্ড যন্ত্র-শিল্পের দেশ; অতএব এই শ্রম-বিভাগ অনুযায়ী বিনা-দ্বিধায় ভারতের কৃষি-শিল্প ইংলণ্ডের যন্ত্রের শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জোগান দেবে। পরিবর্তে ভারত পাবে ইংলণ্ডের কাছ থেকে তৈরী মাল। মানচেষ্টার গোষ্ঠি আরও বলতে চাইলেন, আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সমবায়

'The existence of an old commercial body was by itself sufficient to to scare away host of potential merchants or merchantile enterprises from the field.'

শিল্প সংগঠনে পৃথিবীর সকল দেশই সাহায্যকারী একক (Complimentary units) এবং সেই পারস্পরিক ক্ষতিকর কোন বাধা-নিষেধ বা পণ্যের উপর শুল্ক বসান অন্যায়। অতএব বৃটিশ পার্লামেণ্ট free trade অর্থাৎ 'অবাধ-ব্যবসায়' নীতি ঘোষণা করলেন কিন্তু নীতিটি যখন কার্যকরী হ'ল তখন বড় অদ্ভুত ঠেকল। House of Commons Committee-তে ১৮৪০ সালে মণ্টোগোমারী মার্টিন এই নীতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, —সেদিন যে মুক্ত ব্যবসায় নীতির রব উঠল তা কেবল এ দেশের জন্যই, ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে পারস্পরিক ভিত্তিতে নয়।* বৃটেনের শিল্প দ্রব্য সেদিন বিনাবাধায় ভারতে প্রবেশ করতে পারত অথচ আইনের সাহায্যে সেদিন ভারতের পণ্যকে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। ইংলণ্ডে সেদিন কোন নারীর পক্ষে ভারতীয় ক্যালিকো পরিধান দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত। ১৮১৩ সালে Commons Committeeতে John Rankin বলেছিলেন, আমদানি ক্যালিকোর উপর শতকরা ৩ পা, ৬ শি, ৮ পে, শুল্ক ধার্য্য করা হয় এবং যদি তা দেশে ব্যবহার করা হত তবে আরও ৬৮ পাঃ ৬ শিঃ ৮ পেঃ, শুল্ক দিতে হত। আমদানী মসলিনের উপর ছিল শতকরা ৩০ পাউণ্ড শুল্ক আর তা যদি দেশে ব্যবহার করা হ'ত তবে দিতে হ'ত ২৭ পাঃ ৬ শিঃ ৬ পেঃ শুল্ক। রঙিন ক্যালিকো ইংলণ্ডে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তার উপর আবার ২০% টাকার শুল্ক বসান হয়েছিল।

* The cry that has taken place for free trade with India has been a free trade from this country, not a free trade between this country and India.

* To crown all, there was a new duty af 20. p. c. imposed on the consolidated duties.

অবশ্য এই ধরণের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধতা এদেশে যে একেবারেই হয় নি একথা বললে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়। প্রথমদিকে প্রতিবাদ প্রতিরোধের চেষ্টাও হয়েছে। জনাব মীর কাশিম সেদিন দেশেব শিল্পের শোচনীয় অবস্থা দেখে দেশের প্রচলিত আভ্যন্তরীণ শুল্ক Inland duties একেবারেই (দেশীয় রাজ্যের উপর প্রযোজ্য) তুলে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল—আভ্যন্তবীণ বাণিজ্যে দেশীয় ধনিক-ব্যবসায়ীদের ইংবেজ-বণিক ব্যবসায়ীদের সাথে সমান সুযোগ দেওয়া। কোম্পানী পূর্ব্বেই ইংরেজদের এই শুল্কের হাত থেকে রেহাই দেন। যাই হোক মীবকাশিমের দেশীয় শিল্প প্রীতি ইংবেজদের মনঃপুত হল না! তিনি সেদিনের বিদেশী কর্তৃপক্ষের বোষানলে পড়লেন। সেদিন অপরাপব দেশীয় সহকর্ম্মীদের (মিরজাফর, নাজিমুদ্দিন) সহযোগীতাব অভাবে তাঁব স্বদেশী শিল্পকে রক্ষা করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পদচ্যুত হলেন। মিবজাফরকে বসান হল গদীতে। কিন্তু মিরজাফব এবং পরবর্তী নবাব নাজিমুদ্দিন কোম্পানীর প্রতিটি কাজ আইন ও নীতি সমর্থন করে এসেছেন। ফলে ১৭৬৫ সালের মধ্যেই কোম্পানী গোটা বাংলার প্রকৃত মনিব হয়ে দাঁড়াল। এর পরবর্ত্তী ঘটনা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

এই সকল নীতি ও কার্য্যক্রমের ফল যা অবশ্যম্ভাবী, তা ঘটেছিল এবং যা উদ্দেশ্যে ছিল তাও সফল হয়েছিল। মণ্টোগোমারী মার্টিন Commons Committee সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ১৮১৯ সালে ভারত থেকে ১,৩০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের তুতজাত দ্রব্য রপ্তানী করা হয় কিন্তু সেই সংখ্যা একেবারে নেমে দাঁড়াল ১০০,০০০ পাউণ্ডে ১৮৩২ সালে। আর অপর দিকে ভারতে বৃটেনের তুলাজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়েছিল ১৮১৫ সালে ২৬,৩০০ পাউণ্ড এবং ১৮৩২এ সেই আমদানীর পরিমাণ উঠে দাঁড়াল ৪০০,০০০ পাউণ্ডের উপর। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের এই শোচনীয় পতনের উল্লেখ করে মণ্টোগোমারী

সাহেব বলেছিলেন, "আমরা ২৫ বছর ধরে ভারতবর্ষকে বাধ্য করেছি আমাদের তৈরী পণ্য গ্রহণ করতে। আমাদের পশমীদ্রব্য বিনা শুল্কে, কার্পাস শতকরা ২% টাকা হার শুল্কে এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য পণ্য।

কিন্তু এ গেল কোম্পানীর ধন বৃদ্ধির কথা আর তাও পূর্ব্বতন বণিক-বৃত্তিগত অর্থনীতির মাধ্যমে। সেদিনের উঠতি মধ্যবিত্ত-শিল্পপতিরাও এতে লাভবান হন নি বা নূতন ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে তার প্রয়োজনীয় উপাদানে সার্থক হবার সুযোগ পেল না। তাই প্রয়োজন হল চার্টার আইনগুলির। এ সম্পর্কে পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

সেদিন ইংলণ্ডের টাকার বাজার (money-market) দ্রুত সুসংগঠিত এবং সুদৃঢ় হচ্ছিল এবং ক্রমশঃই ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে অপরাপর দেশে টাকা খাটাবার প্রয়োজন দেখা দিল। অধিক মুনাফার লোভে সেদিন বৃটিশ মূলধন ফরাসী দেশ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং আমেরিকাতেও চালান দেওয়া সুরু হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে নেপলিয়ন ফরাসী ও অন্যান্য continental দেশগুলিতে বৃটিশ বাণিজ্যপোতের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়ায় ইংলণ্ডের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ল নূতন বাজারের। হাতের কাছেই ছিল ভারতবর্ষ। কিন্তু বণিক বৃত্তিবাদের প্রতিভূ কোম্পানীর নীতি ও কার্য্যক্রম এদিক দিয়ে খুব সহায়ক হবে না উপলব্ধি করে সেদিনের শিল্পপতিরা 'free trade' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে প্রথমে ১৮১৩-এর চার্টার পাশ করলেন। ১৮১৩ এর চার্টারের পরেও ১৮৩৩ এর চার্টারের প্রয়োজন কেন? ১৮১৩ চার্টারে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বাতিল করে দেওয়ায় প্রাচ্যেঅর্থলগ্নীর কাজে উৎসাহ পেয়েছিল। কিন্তু চার্টারের ব্যবস্থানুযায়ী লাইসেন্সপ্রথা থাকাটা যেন সেদিন মলমে মাছি পড়ার মতই হয়েছিল। তাই ইংরেজ পুঁজিপতিদের মধ্যে যারা নিঃস্ব তারা অবাধ প্রবেশ অধিকারের দাবী

জানিয়েছিল। অর্থাৎ ১৯১৩ সালের চার্টারের মাধ্যমে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকারের অবসানের ফলে প্রাচ্যে বৃটিশ মূলধন খাটাবার একটা প্রেরণা জুটল। কিন্তু চার্টার ব্যবস্থানুযায়ী লাইসেন্স প্রথার ব্যবস্থা থাকায় যে সুবিধাটা হবার সম্ভাবনা ঘটেছিল তা ব্যর্থ হয়েছিল। তাই সেদিন উঠতি মধ্যবিত্ত "নিঃস্ব বুর্জোয়া" শ্রেণীদের পক্ষ থেকে অবাধ প্রবেশাধিকারের দাবী তোলা হয়েছিল। এটা খুব সহজেই বোঝা যায়, সেদিন ইংলণ্ডের কৃষক বা ছোট কারিগরদের পক্ষে ভারতে জীবিকার সংস্থান করার সুযোগ ছিল না; তাই তাদের পক্ষ থেকে এই দাবী আসে নি। আর বৃটিশ ধনিক শ্রেণীর সৌভাগ্যক্রমে ভারত ছিল তাদের পক্ষে সস্তা শ্রমের বাজার এবং ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে ভারতের জল হাওয়া ও এদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা বিবেচনা করে সেদিন তাদের না আসাটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত ছিল। ১৮৩২ সালে পার্লামেণ্টারী কমিটিতে সিভিলিয়ান লুসিংটন মন্তব্য করেছিলেন, বড় ও ছোট ধনিকদের ভারত পাঠানই ইংলণ্ডের পক্ষে সুবিধাজনক। আর সেদিন ওলন্দাজ বা ফরাসীদের কাছ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হবার ভয়ও ছিল না। এইসব নানাকথা বিচার বিবেচনা করে তারা দেখলেন এই-ই হল ভারতে মূলধন ও বুদ্ধিজীবিদের পাঠানোর উপযক্ত সময়। 'এখন অথবা কখনই নয়' ছিল সেদিনের বৃটিশ ধনিকদের ভারতে বৃটিশ মূলধন খাটাবার আন্দোলনের মূলনীতি। ১৮৩৩ তার পথ করে দিল।

১৮৩৩ এর সনদে বৃটিশ ব্যবসায় ও মূলধন কারিগরী বিদ্যা ও অর্থকে আমন্ত্রণ জানান হল ভারতে। আর সেদিন প্রাচ্যে বৃটেনের জাতীয় আয়ের বিশিষ্ট অংশকে নিয়োগ করবার ঝুঁকি নেওয়ার শঙ্কাও ছিল না। পার্লামেণ্টারী কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বাংলা থেকে আগত সিভিলিয়াম W. B. Bayley বলেছিলেন, "আমি মনে করি না, ইংলণ্ড থেকে ভারতে মূলধন পাঠাবার

প্রয়োজন আছে বরং ভারত থেকে ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর যে অর্থ পাঠাতে হয় তা না পাঠিয়ে ভারতে রেখে নিয়োগ করাই ভাল বলে আমার মনে হয়।'* (Parl, Com. PP.—735—11 of 1831—32 Q—926). Holt Mackinzie ঠিক এই ধরণের কথাই বলেছিলেন, তবে একটু বিশদ ভাবেই, "সরাসরি মূলধন পাঠানো খুব ফলপ্রসূ বলে অনেকেই আশা করতেন না। শিক্ষিত পরিশ্রমী ও সাধুলোককে যদি তার পরিবর্ত্তে ইংলণ্ড থেকে পাঠান যায় এবং কিছুকাল ভারতে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তবে এরা অল্পকালের মধ্যেই তাদের চারিত্রিক ও পরিশ্রমের গুণে সার্থক পুঁজিপতি হয়ে উঠতে পারবে। সাথে সাথে কিছু মূলধন Speculatorরাও পাঠাতে পারে। এই পুঁজিপতিদের পক্ষ থেকে প্রাচ্যে Laisez faire নীতির অনুসরণের দাবী তোলা হয়েছিল। বৃটেনের প্রয়োজন মূলধনের চেয়ে শিল্প ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ নীতিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের পাঠান। (Britain was to export more of character than of capital).†

কিন্তু এই চার্টার ভারতের সেদিনের শিল্পের পক্ষে মৃত্যুবান স্বরূপ হ'ল। এর কিছুটা আলোচনা পূর্ব্বেই করেছি। ১৯ শতকের সুরু থেকেই ভারতীয় কুটীর শিল্পে বিদেশ থেকে আমদানি করা যন্ত্রশিল্পের পণ্যের সাথে বেঁচে থাকার সংগ্রাম সুরু করেছিল।

---

* I am not sanguine as to the introduction of Capital by direct remittance ; though it may be done to a certain extent by commercial speculators embodying agents ;...There seems to be scope for men of education, good character and industry who landed in Bengal if befrienned and supported for a short time, would, I think, become a capitalist by force of that character and industry , at the same time speculators from home might send out capital (Ibid—PP—785—11 of 1881—82 Q 1909) 1

† "If all the articles of the manufacturing produce of India were swept away and no new ones created to supply this vaccum of export how can any remittance on private or public account be made to Europe ? It will no longer be possible to realise the revenue at its present normal amount." (Lord Bentincks minutes of 80th May 1889 PP. 784 of 1881-31 APP-855-9).

কিন্তু ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের সাহায্যে কোম্পানীর ভারতীয় ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার অবসানের সাথে সাথে ভারতীয় শিল্পের পতন বিশেষ লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে কোম্পানী সেদিন বিশেষ করে এদেশের শাসন রাজনৈতিক ব্যাপারেই অধিকতর ভাবে ব্যস্ত থাকত এবং মনোযোগ দিত এবং তার ফলে এদেশে বৃটেনের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত ও দৃঢ় করবার দায়িত্ব দিয়েছিল ওদেশের বেসরকারী বণিক সম্প্রদায়ের হাতে। আর এই বেসরকারী ব্যবসায়ী ও উঠতি শিল্পপতিরা নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে দাবী করেছিল ভারতের দেশীয় শিল্পের সম্পূর্ণ ধ্বংস। কিন্তু কোম্পানীর পরিচালক-বর্গ এই ধরণের পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বেন্টিঙ্ক লিখেছিলেন, "কোম্পানীর পরিচালকবর্গ অনেকে মনে করতেন, যদি এমন করে দেশের শিল্পকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয় তাহলে রাজস্ব ত হ্রাস পাবেই, য়ুরোপে সরকারী বা বেসরকারী খাতেই দেয়ই বা কি করে পাঠান যাবে?

কোম্পানীর লোকদিগের ছিল রাজস্বের, রাজ্যশাসনের লোভ আর বেসরকারী ব্যবসায়ী ও উঠতি মধ্যবিত্ত শিল্পপতিদের ছিল গোটা গ্রীষ্মমণ্ডল এলাকাকে তাদের দেশের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের ভাণ্ডারে পরিণত করা তৈরী মালের নিরঙ্কুশ বাজার হিসাবে ব্যবস্থা করার স্বার্থ। ১৮৩৩ এর চার্টারের তাই বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যতের পথ চিরতরে রুদ্ধ করবার ব্যবস্থা হল।

য়ুরোপীয়দের এদেশে অবাধ প্রবেশ ও বাণিজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠার ২০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গীয় বণিকসভা (১৮৩৪), মাদ্রাজ বণিকসভা (১৮৩৬), এবং বোম্বাই বণিকসভা (১৮৩৬) প্রতিষ্ঠার সাহায্যে এদেশে ওদের দেশের পণ্যের বাজার ব্যাপক ও সুদৃঢ় করার কাজ সুরু হয়। লীভারপুল ও ল্যাঙ্কাশায়ার শিল্পগোষ্টির এজেণ্টরা সে দিকে শুধুমাত্র ভারতের জীবনযাত্রা, রুচি, পোষাক-পরিচ্ছদ

সম্পর্কেই খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন, তাই নয়, ভারতে আমদানি করা পণ্যের চাহিদা বাড়াবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

ভারতের পক্ষে এই যুগটি বৃটিশ ধনতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাল হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। সেদিন যে ভারতকে শুধু কাঁচামালের আকরে রূপান্তরিত করেছিল তা নয়, সাথে সাথে ভারতের শিল্পকলার পতন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে ধ্বংস এই সময়ে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই সময়কে তাই ভারতে বৃটিশ ধনতান্ত্রিক বিকাশের dress reharsal বা পোষাক অভিনয়ের কাল হিসাবে বর্ণনা করতে পারি।

ইংলণ্ডে এই সময় দ্রুততালে ধনতান্ত্রিক বিকাশ সুরু হয়েছিল তাতে সেদিনকার শিল্পপতিরা অনুভব করলেন ইংলণ্ডের ভৌগলিক সীমার মধ্যে এই বিকাশকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে একদিকে Law of Diminishing Return সক্রিয় হয়ে উঠবে, ফলে উৎপাদন খরচা বৃদ্ধির সাথে সাথে মুনাফায় আঘাত লাগবে। আর তাছাড়া মূলধন বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজারে এত অধিক পরিমাণে পণ্যের আমদানি সুরু হ'ল যে পণ্যের মূল্য পড়তি বাস্তব হয়ে উঠল। তাই মুনাফা বাঁচিয়ে দেশের উদ্বৃত্ত মূলধন রপ্তানির কথা সেদিনের শিল্পপতি মহল চিন্তা করতে শুরু করলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি কালে বৃটিশ পুঁজিবাদ চরম শিখরে পৌছে গেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ক্রমহ্রাসমান বিধি সক্রিয় হ'য়ে উঠবে।

মূলধন খুব দ্রুত সঞ্চিত হচ্ছিল এবং Joint stock ব্যবসায়ীরা য়ুরোপের বাহিরেও বাজারের জন্য প্রচেষ্টা আরম্ভ করলেন। তাই দেখা গেল ১৯ শতকের তৃতীয় ভাগে মূলধনের গতি প্রাচ্যাভিমুখী এবং পরিণামে তাই ভারতে আধুনিক শিল্পযুগের পত্তন করে। এই আলোচনা থেকেই সেদিনের বৃটিশ ধনতান্ত্রিক-বিকাশ ও ভারতের অর্থনৈতিক বিবর্তনের সাথে চার্টার আইনের কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা সহজেই বুঝা যায়।

ভারতের আধুনিক শিল্প-বিকাশে ভারতের ব্যর্থতা নিয়ে কথা

উঠলে বহুদিন থেকে এই কথাটাই জবাব হিসাবে চলে আসছে, আমাদের দেশের সেদিনের তীব্র দারিদ্রের জন্যই আমরা সেদিন আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটাতে অপারগ হয়েছিলাম। যাঁরা একথা বলেন তাঁরা হাতের কাছে নজীর হিসাবে দেখিয়েও থাকেন, ভারতীয়দের দ্বারা ঘটেনি—ঘটেছিল বিদেশী মূলধনের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে। হঠাৎ শুনে মনে হয়, এই বুঝি এই ব্যাপারের সঠিক ব্যাখ্যা। কেননা আজ অবধিই তো দেখছি এদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পই বিদেশী পরিচালিত; কিন্তু প্রাক বিদেশী আগমনের যুগ আর বিদেশী আগমনোত্তর যুগে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটা পাঠ নিলে উপরের জবাবকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয়।

প্রাচ্য সম্পর্কে একটা কথা এত বেশী সত্য যে তা প্রায় প্রবাদে দাঁড়িয়েছে, তা হ'ল মধ্য যুগে প্রাচ্য ছিল মূল্যবান ধাতুর ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে অপর দেশ থেকে মূল্যবান ধাতু এসে জমা হত। প্রথম অধ্যায়ে এর কারণও উল্লেখ করেছি ভারতের ক্ষেত্রে। একথা বলেছি সেদিন যখন ইংরাজ বেনেরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছিল তখন এদেশীয় চেট্টি, শেঠজীরাই তাদের পুঁজির যোগানদার ও ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করেছে এবং তার পুরস্কার হিসাবে পরবর্ত্তি কালে এই শেঠজীরা সরকারী শাসন ব্যাপারে সুবিধাও ভোগ করেছিল। Hobson তাঁর Export of Capital পুঁথিতে এবং Jenks তার Migration of British Capital পুঁথিতে এই কথারই সমর্থন করেছেন। তাঁরা লিখেছিলেন, ওলন্দাজ টাকার বেনেরা এদেশে বৃটিশ বণিক কোম্পানীর সাহায্যে আসবার আগে এই ইংরেজ বণিকদের ব্যবসায়ে দেশীয় শেঠদের মূলধনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। Moreland তাঁর Akbar to Aurangib বইতে লিখেছিলেন মাদ্রাজে ইংরেজী কোম্পানীর চেট্টিদের সমর্থন পাবার সৌভাগ্য ঘটেছিল। এই চেট্টিদের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব মূলধন

নিয়ে কোম্পানীর কণ্ট্রাক্টর এবং এজেণ্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন। সেই ১৬৮৮-৮৯ সালে অর্থাৎ ইংলণ্ডে রক্তপাতহীন বিপ্লবের দিনে কোম্পানীর বেনেরা কোম্পানীর কারবার পরিচালনার জন্য একটি জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানী সংগঠন করেছিল। তাতে মূলধন ছিল একশত শেয়ারে ২০,০০০ প্যাগোডা (ওলন্দাজ-মুদ্রা)। বিলাতের টাকার বাজারে ওলন্দাজ মূলধনের পাড়ি দেবার পরেও এই ব্যবস্থা বিভিন্ন আকারে প্রচলিত ছিল।

জগৎশেঠদের সম্পর্কে সেদিন বার্ক সাহেব বলেছিলেন, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের চেয়ে এঁদের কারবার কম ব্যাপক ছিল না। ১৭ শতকের শেষভাগে এই শেঠ গোষ্ঠি বাংলাদেশে আসেন এবং মুর্শিদ-কুলী খাঁর রাজদরবারে financier হন এবং শেঠদের উপর সেদিন রাজকোষে (Imperial exchequer) বাংলার দেয় মেটাবার ভার পড়ে। ইতিহাসে এও স্পষ্ট, সেদিন ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নবাব মুর্শিদকুলী এই শেঠ গোষ্ঠির সাহায্যে বাংলাদেশে তাঁর শাসন বজায় রেখেছিলেন এবং শেষে এদেরই সাহায্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েছিলেন। এই শেঠ গোষ্ঠী মুর্শিদকুলী খাঁব পৌত্র সরফরাজ খাঁর পতন তরান্বিত করে এবং আলীবর্দ্দীর সিংহাসনদখলের সুবিধা করেন। Don juan এর ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয় এরাই সেদিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেন। বলা হয়ে থাকে, আলীবর্দ্দীর শাসন কালের প্রারম্ভে শেঠদের মূলধনের পরিমাণ ছিল দশ কোটি টাকারও বেশী। খুব সত্বরই এঁরা গোটা প্রদেশের ব্যাঙ্কগুলির উপরে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন এবং প্রদেশের সকল ব্যাঙ্কই এঁদের ব্যাঙ্কের সদস্যভুক্ত হলেন। গোলাম হোসেন খাঁর Suir Mutagharin পুঁথিতে আরও বলা হয়েছে নগদ টাকার মালিক এই শেঠ গোষ্ঠিরা সেদিন শুধু নবাবদেরই নয়, জমিদার ও ধনী জোতদারদেরও ব্যাঙ্কার ও খাজাঞ্চী হিসাবে কাজ করতেন।

বাংলাদেশে প্রথম অভিযান কালে মারাঠারা তাদের (শেঠদের-লেখক) কুঠি থেকে আর্কট মুদ্রায় দু'কোটি টাকা লুঠ ক'রে নিয়ে গিয়ে ছিল কিন্তু তা'তে তাদের উদ্যম কোনরূপ ব্যাহত হয়নি বা সম্পদেও টান পড়েনি। 'দর্শনীহুণ্ডি'র নীতিও তাঁরা অব্যাহত রেখেছিলেন।*

একথা প্রথম অধ্যায়ে বলেছি এই শেঠ গোষ্ঠি ১৮ শতকের মধ্যভাগ থেকে ক্রমশই নবাগত বৃটিশ শক্তির সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। এর কারণও তখন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। Long সাহেব 'Selections from unpublished records of the government' সংকলন পুঁথিতে লিখেছেন, ১৭৪৯ সালে নবাব যখন কাশীমবাজার অবরোধ করেছিলেন তখন ইংরাজেরা এই শেঠদের মাধ্যমে ১২ লক্ষ টাকা নবাবকে দিয়ে রেহাই পান। একথা তো সর্ব্বজন বিদিত, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রে এই শেঠরা ছিলেন নেতৃস্থানীয়। Long সাহেব আরও লিখেছেন, ইংরাজরা শেঠদের এই সকল কাজে সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কার হিসাবে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শেঠদের এক ভোজ সভায় আপ্যায়িত করেন, তাতে সেদিনই খরচ হয়েছিল ১৭,৩৭৪ টাকা!

কিন্তু এই সুদিনের পর দুর্দ্দিন আরম্ভ হ'ল। পরবর্ত্তি নবাব মীরকাশিম এই শেঠদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নৃশংসভাবে হত্যা করে এঁদের রাজনৈতিক প্রভাবের সম্পূর্ণ অবসান ঘটান। তারপরে ১৭৬৯-৭০ সালে দুর্ভিক্ষ এদের আর্থিক প্রাধান্যকে প্রবলভাবে আঘাত করে।

*With huge cash in their counters, they were not only the bankers and treasurers of the Nawabs but also of the revenue farmers and Zamindars. During their first invasion of Bengal, the Marathas carried from their kuthi two crores of rupees in Arcot coin only, but this did not curb their enterprising spirit or affect their resources appreciable, Then continued their custom of issuing "Darsani Hundies" of one crore rupees.

এই প্রসঙ্গে উমিচাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনিও সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোটা investmentএর এক-তৃতীয়াংশের দায়িত্ব নেবার প্রস্তাব করেন। তিনি এত সম্পন্নশালী ও উদ্যমী পুরুষ ছিলেন যে ১৭৮৪ সালে কোম্পানীর মোট পল্লীর এক-তৃতীয়াংশের দায়িত্ব নেবার প্রস্তাব করেছিলেন।

তিনি উপঢৌকন ও সেবার মধ্যে দিয়ে নবাবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের উপর এত প্রভাব ও প্রতিপত্তি গড়ে তোলেন যে ফোর্ট উইলিয়ামের পরিচালকবর্গ নবাবের সঙ্গে কোন বিরোধ বিসংবাদে বা অন্য কোন অসুবিধায় উমিচাঁদের সাহায্য ও সালিশী গ্রহণ করতেন।

সেদিনের আরও একজনের সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। তিনি হলেন সুরাটের ধনপতি ত্রিবেদী শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনজী নাথজী। এই পরিবার ১৮ শতকে পশ্চিম ভারতের একমাত্র পরিবার যাঁরা কোম্পানীর ব্যবসায় বাণিজ্যে সহায় ছিলেন। অর্জ্জুনজী নাথজীদের সম্পর্কে ১৮৮১ সালে Times of India কাগজের চিঠিপত্র কলমে জবেরীলাল যাজ্ঞিক এক পত্রে লিখেছিলেন 'এরা সেই সময়েই কোম্পানীকে সাহায্য করেছিল, ভারতবর্ষে যখন বিভিন্ন শক্তি ক্ষমতা ও স্বার্থসিদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল, যার ফলে সমৃদ্ধিশালী ভারত সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটে'। তবে বাংলার শেঠজীদের সাথে সুরাটের নাথজী অর্জ্জুনজীদের বহু সামঞ্জস্য রয়েছে। উভয় পরিবারই তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্রে বহিরাগত ছিলেন। শেঠজীরা মাড়োয়ার থেকে এলেন বাংলায় আর নাথজীরা বেনারস থেকে গেলেন গুজরাটে। ১৮ শতকের সুরুতে উভয় পরিবার স্ব স্ব নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে পাড়ি জমালেন। বাংলার satrapদের সাথে মিতালি করে বাংলায় শেঠজীরা নিজেদের ঠাঁই করে নিলেন এবং নাথজীরা আরব বণিকদের সাথে হাত মিলিয়ে গুজরাটে ঘাঁটি করলেন।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, উভয় পরিবারের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন, প্রাচীন ভঙ্গুর দেশীয় অর্থনৈতিক সংস্থা ও ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরলে দাঁড়ান ত যাবেই না বরং সবশুদ্ধ ভেঙ্গে পড়ে যখম হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃটিশ ধনিকদের এদেশে আগমনের মধ্যে এঁরা নূতন সূর্য্যের প্রখর আলো দেখেছিলেন তাই ১৮ শতকের মাঝামাছি কাল থেকেই শেঠ ও নাথজী গোষ্ঠী ইংরেজ সমর্থক হয়ে পড়লেন। হাওয়া কোনদিকে বয় তার ঠিকানা পেয়েছিলেন তাঁরা।

নাথজীগোষ্ঠী ১৮ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকেই ইংরেজ কোম্পানীর ব্যাঙ্কার ও এজেন্ট ছিলেন এবং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেদী শ্রীকৃষ্ণনাথজী সরকারীভাবে কোম্পানীর শ্রফ নিযুক্ত হলেন। তাঁরা সেই সময় দুর্গের জন্য ফরমান ও যুদ্ধ জাহাজের জন্য সনদও পেয়েছিলেন কোম্পানীর কাছ থেকে। বাস্তবিক পক্ষে সেদিন বোম্বাইতে Forbes & Co প্রতিষ্ঠার পূর্বে অর্থ যোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়লে এই নাথজী গোষ্ঠীই ছিল পশ্চিম ভারতে ব্যবসায় রক্ষার একমাত্র সহায়। যখন অন্যান্য সকল দিক থেকে কোম্পানীর পক্ষে ঋণ পাওয়া দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ল সেদিন ত্রিবেদীর Rupee Loan কোম্পানীর ভাগ্য পরিবর্ত্তনের অতি শুভদিনের সূচনা করে।* বোম্বাইএর Forbes & Co. এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার চার্লস্ Forbes এর এদেশে আগমনের পূর্ব্বে কোম্পানীর অসময়ে, দুর্দিনে নাথজীরাই ছিলেন একমাত্র সহায়। হল্যাণ্ড তাঁর Bombay I পুঁথিতে লিখেছিলেন, ১৮৫৪ সালে লর্ড নর্থের উত্তর ভারত অভিযান কালের দুর্দিনে ত্রিবেদী শুধুমাত্র মুদ্রাতেই ৩২ লক্ষ টাকা বোম্বাই কর্ত্তৃপক্ষকে ঋণ দেন। আবার ১৮১৩ সালে নেপাল যুদ্ধের খরচাও নাথজীই বহন করেন—তবে

---

* He was so solvent and enterprising that in 1784 he proposed to undertake third of the company's whole investment (Dutta—Studies in the History of Bengal).

সাহায্যের সঠিক পরিমাণ জানা যায় নাই। তবে ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১৮৩০ সালের মধ্যেই Forbes & Co পশ্চিম ভারতে আধুনিক কালের Joint Stock ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের গোড়া পত্তন করেন। ত্রিবেদী দেহত্যাগ করেন ১৮২২ সালে।

সেদিনের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও মূলধন

এই প্রসঙ্গে সেদিনের দেশীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার একটা মোটামুটি পরিচয় আলোচনার পক্ষে সহায়ক হবে বলে মনে হয়। ১৯ শতকের সুরুতে Agency house এবং Joint Stock ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রাধান্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তথাপি একথা সত্য কোম্পানী রাজত্বের শেষ অবধি দেশীয় ব্যাঙ্ক ও শেঠ গোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে তাঁদের ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ১২ শতক থেকে সুরু করে কোম্পানীর রাজত্বকাল অবধি এই দেশীয় ব্যাঙ্কিং ও শেঠ গোষ্ঠী ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায়কে আর্থিক সাহায্য করেন। শাসক গোষ্ঠীর সাথে এই ব্যাঙ্কারদের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শেঠ-নাথজী গোষ্ঠীদের পরিচয় আগেই পেয়েছি। দেশীয় ব্যাঙ্কারদের সম্পর্কে হেন্‌রি টুকার লিখেছিলেন, ১৮ শতকের সুরুতে এই শেঠ গোষ্ঠীদের অধীনে প্রভূত মূলধন রয়েছে (a large capital) আর পরবর্ত্তী এক যুগের মধ্যেই এই মূলধন বাজার থেকে কিছু উবে যেতে পারে না। অতএব সহজেই অনুমেয় এজেন্সী হাউস প্রতিষ্ঠার উত্তরকালেও অনেক দিন পর্য্যন্ত এই মূলধন কি দেশীয় বণিক কি বিদেশী ব্যবসায়ী উভয়কেই সাহায্য করেছে। Malcolm তাঁর Memoir of Central India পুঁথিতে লিখেছিলেন, তিনি, বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ এজেন্সী

হাউসের বহুদূরে মধ্যপ্রদেশে বাস করেও শ্রফদের ব্যবসায়ে আর্থিক সাহায্যের প্রভাব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। আবার সারদা রাজু তাঁর Economic Conditions পুঁথিতে লিখেছেন, দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী মাত্তু-কোট্টি চেট্টি গোষ্ঠীদের ব্যবসায় ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেদিনের দক্ষিণ ভারতীয় ব্যাঙ্কারদের মূলধনের কাহিনী প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এদের সম্পর্কে কুক্ সাহেব লিখেছিলেন, সিংহলে চেট্টিরা ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করত এবং বিলের উপরে কাটা হুণ্ডি ইংরেজ বণিকদের নগদ টাকা সরবরাহ করবার জন্য মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা এই প্রেসিডেন্সী বিভাগগুলিতে এদের এজেন্ট ছিলেন।* ১৮৪৪ সালে স্লীম্যান্ লিখেছিলেন ভারতের মূলধন ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট ছিল।

শতকের সুরু থেকে সিপাহী বিদ্রোহ অবধি রাজদরবার ও রাজশক্তির সাথে এই শেঠ, চেট্টি মায়ারাম ব্যাঙ্কার গোষ্ঠীদের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার পরিচয় নিম্নের বিবরণ থেকে মিলবে।

অযোধ্যা এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কার ঃ—দেশী ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করে ক'লকাতার প্রতিষ্ঠানগুলি অযোধ্যা বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে যাবার পর থেকে রাজবংশকে বিপুল অর্থ সাহায্য করত।**

মারাঠা শ্রফ ও বাজীরাও ঃ প্রায় একই সময়ে নির্ব্বাসিত পেশোয়ার সাথে একজন মারাঠা ব্যাঙ্কারের ষড়যন্ত্রের খবর পাই। এই ব্যাঙ্কার হলেন সুরাটের ব্যাঙ্কার তুলসীরাম মায়ারাম—উত্তর-ভারতে এঁদের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। ১৮২৯-৩০ সালের ষড়যন্ত্রে তিনি

* The Chettis acted as Banker and supplied the British Merchant with cash for bills of exchange on Madras, Bombay and Calcutta.

** Oudh and Indian Bankers : Native Banking House particularly the Calcutta houses had a conspicious share in financing the Oudh dynasty since in come under British Control (Basu—Oudh & East India Coy. page 102).

ধরা পড়েন। ষড়যন্ত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবে এ থেকে একটি বিষয় জানা যায়, তা'হল মায়ারামের মত ছোটখাট একজন শ্রফও ১৮২৯-৩০ সালে কোম্পানী রাজ্যের বিরুদ্ধে নিজের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতির ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেন নি।* তুলসীরাম মায়ারাম রাজনীতিবিদ ছিলেন কেননা তাঁর শ্রেণী স্বার্থ নূতন অর্থনীতিক শক্তির পক্ষেই ছিল—সামন্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার পক্ষে ছিল না। জগৎশেঠ, রুস্তমজী অথবা ঠাকুরেরা বিদেশী কোম্পানীর প্রতি ঝুঁকেছিলেন। কারণ কোম্পানীর শাসনে শান্তি, প্রগতি ও প্রাচুর্য্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল।

উঠতি মধ্যবিত্ত-ধনী বণিক শেঠ সম্প্রদায় সেদিন নূতন অর্থনৈতিক সংস্থার ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি বৃটিশ পক্ষ অবলম্বন করেন, এ আলোচনা পূর্ব্বে করা হয়েছে। সেদিন যাঁরা বৃটিশ বণিকবাদ ও যন্ত্রশিল্প প্রসূত নূতন অর্থনৈতিক তথা রাষ্ট্রনৈতিক বনিয়াদ গড়ে ওঠবার সম্ভাবনার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই বড় বড় ভূস্বামী, রাজা, নবাব, জমিদার সম্প্রদায়।

সিপাহী বিদ্রোহের কালেও দেখা গেছে মূলধন যাঁদের আছে তাঁরা ইংরেজ পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। কুক্ সাহেব তাঁর Banking পুঁথিতে লিখেছেন, সিপাহীবিদ্রোহের সেই সংকটকালে লালাজ্যোতিপ্রসাদ, বংশীলাল আবেচাঁদ অথবা মুন্দ্রা শেঠজী প্রভৃতি যাঁরা কোম্পানীকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের কথা ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় বহুদিন স্মরণ রেখেছিল।

* Maratha Shroff and Baji Rao. At about the same time we come across the intrigues of a Maratha Banker with the last Peswa in exile. This was Tulsiram Mayaram, a Banker of Surat having house in Calcutta and operating in plotting. The conspiracy was abortive and not of much importance. But it reveals that even as late us 1829-80 a not too wealthy Shroff for such was Tulsiram Mayaram could risk an enterprise against the Company Raj. (Gupta—The last Peswa and the English Commissioners),

চার্টার আইনের পর থেকেই ভারতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সুসংগঠিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলবার দিকে নজর দেন তাঁদের দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির স্বার্থে। ১৯ শতকের মাঝামাঝি কালে ভারতে দুই ধরণের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। একদিকে এজেন্সী হাউসগুলি এবং অপর দিকে প্রকৃত ব্যাঙ্কগুলি যেমন The Bank of Bengal, The Union of Banks এবং Bank of Western India.

এদেশে এজেন্সি হাউসগুলি সাধারণতঃ এদেশের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্লীম্যান্ সাহেব লিখেছিলেন এই এজেন্সি হাউসগুলি তাদের মূলধনের এককণাও (a particle of Capital) ইংলণ্ড থেকে আমদানি করেনি। Alxander & Co নামে কলিকাতায় একটি এজেন্সি হাউসের অংশীদার টমাস ব্রোকেন ১৮৩১-৩২ সালের পার্লামেণ্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এদের মূলধন সঞ্চয় ও খাটবার প্রণালী সম্পর্কে বলেছিলেনঃ গভর্ণমেণ্টের সামরিক ও বে-সামরিক বিভাগে নিযুক্ত উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী বেয়ারা চাকরীর চেয়ে ব্যবসায়ে নিজেদের বেশী যোগ্য বলে মনে করতেন। কোম্পানীব চাকরী ইস্তফা দিয়ে এই এজেন্সি হাউসগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। এজেন্সি হাউস ও অন্যান্য সওদাগরী ব্যবসায় কর্ম্ম-গ্রহণ করেন। এই সমস্ত ভদ্র লোকদের সরকারী বিভিন্ন বিভাগে বহু জানা-শোনা বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। যাঁহারা ছিলেন এঁদের পুঁজির প্রথম উৎস। এই পুঁজি এই ভদ্রলোকেরা অন্যকে ধার দিতেন অথবা ব্যবসায়ে খাটাইতেন। অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় এঁরা মূলধনের মালিক ছিলেন না। মূলধনের লেন-দেনের কারবারী ছিলেন! এই লেন-দেনের সুদে ভারতের মধ্য দিয়েও কমিশনের আকারে এঁরা মুনাফা করতেন। ক্রমশ ব্যবসা-বাণিজ্যের সার্থক পরিচালনার

মধ্যে দিয়ে এঁরা সহজেই বিপুল বিত্তের মালিক হয়েছিলেন এবং দেশে ফেরবার সময় অধিকাংশই ভারতে রেখে আসতেন। যারা এঁদের ক্ষেত্রে এদেশ থেকে নূতন যেতেন—তাঁরাও সাথে করে মূলধন নিয়ে যেতেন না। এই প্রকারে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বিপুল সঞ্চয় ও পুঁজির সংরক্ষক হয়ে পড়ে।*

শুধু উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী তাঁদের উপার্জ্জনের উদ্বৃত্ত অংশ ছাড়াও অনেক ভারতীয় এজেন্সি হাউসে পরবর্তিকালে অর্থ গচ্ছিত রাখতেন। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এঁরা অংশীদারও হয়েছিলেন।

এ দেশে সঠিক প্রকৃত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে উঠবার ব্যাপারে স্বদেশী মূলধন ও স্বদেশী উদ্যম গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। এদেশীয়দের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞান হ্রাস পায়নি। একথার সমর্থন পাওয়া যায় যখন দেখি ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী সরকারী ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ভার অর্পণ করেন দুইজন ভারতীয় হুজরীমল ও রায় দয়াল চাঁদের উপর।

*The Agency house were chiefly formed of gentleman who had been in the civil and military services, who finding their habits perhaps better adapted for commercial pursuit, obtained permission to resign their situations and engage in agency and merchantile business. They had, of course, a great many friends and acquitances. In their respective services and from these gentlemen they received their accumulations, They lent them to others or employed them themselves for purposes of commerce : They were at first, in fact the distributors of capital rather than the possessors of it. They made their profit in the usual course of trade, by the difference in interest in lending and in borrowing money and by commission. In course of time carrying on a successful commerce many became possessors of a large capital and returned to this country leaving most part of it there ; but the persons who succeeded generaly came in without capital of their own, the system being continued and those houses became the usual depository of a great possition of savings and accumulations of civil and military services in India.

আবার Bank of Bengal এর সর্ব্বপ্রথম পরিচালকদের মধ্যে কলিকাতার খ্যাতনামা মহারাজ সুখময় রায়ের নামও পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Cullings from Bengali Newspapersএ আরও সংবাদ পাই, এই ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের প্রায় ২০ বছর ধরে দেওয়ানের কাজ করেছেন কলুটোলার সেনরা,—বেনেরা নয়, উচ্চ বর্ণের হিন্দু। য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের সাথে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতার কথাও সুপরিচিত। ১৮৩৩ সালে এই ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ ১২ জনের মধ্যে ৪ জনই ছিলেন বাঙ্গালী [Cooke —Rise progress and present condition of Banking in India]. আবার ঢাকা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কাজী আনিমুল্লা, কাজী আব্দুলগণি ও নন্দদুলাল দত্তের নাম পাওয়া যায় [ঐ ২৩৫]। বেনারস ব্যাঙ্কের (১৮৪৫) সংগঠকদের অধিকাংশই ভারতীয় ছিলেন। এই সংগঠকদের মধ্যে ২ জন মারাঠী এবং অন্ততঃ ৩ জন বাঙ্গালী ছিলেন [ঐ ২৩৭]। যখন Bank of Bombay প্রতিষ্ঠিত হল তখন তার শেয়ারের এত চাহিদা হয়েছিল মূলধনের পরিমাণ প্রস্তাবিত ৩০,০০,০০০৲ থেকে বাড়িয়ে ৫২,২৫,০০০৲ টাকা করা করা হয়েছিল। এক হাজার টাকা মুল্যের ৫২২৫টি শেয়ারের ১৬৬৪ খানা শেয়ারই ভারতীয়েরা ক্রয় করেছিলেন। বোম্বাই এর কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার (১৮৪৫) অর্ধেক উদ্যোক্তারাই ছিলেন পার্শী। তাঁরা হলেন রামনজী, হারমুনজী, জীজীভাই, দাদাভাই মানেকজী, লীমজী, কারসেওজী এবং কাওয়াসজী নানাভাই (Cooke ঐ-পৃঃ ৩২৯-৩০)। পরে ১৮৬০ সালের পাটের ফটকা বাজার খেলতে গিয়ে এই ব্যাঙ্কের সর্ব্বনাশ ঘটে। প্রথম বৃহৎ ভারতীয় Joint stock ব্যাঙ্ক হল Central Bank of Western India. ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে কাজ সুরু করে বোম্বাইতে ১৮৬০ সালে। এই ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ সম্পূর্ণ ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত ছিল। কলিকাতা,

হংকং, সাংহাই এবং লণ্ডনে এর এজেন্সি ছিল। প্রথম পরিচালক মণ্ডলী ৩ জন হিন্দু, ২ জন মুসলমান, ৩ জন পার্শী এবং একজন খৃষ্টান নিয়ে গঠিত ছিল (Cook-ঐ-৩৭৫-৭৭)। ছোটখাট ধনী শিল্প-পতিদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ছিল Peoples Bank of India Ltd. (Ca-1810)। এই ব্যাঙ্ক নিচে ৫৲ টাকার পর্য্যন্ত চেক ভাঙ্গাত। এর পরিচালকবর্গের মধ্যে দুইজন বাঙ্গালী ছিলেন। (Cooke-ঐ)।

শুধু ব্যাঙ্কেই সেদিন টাকা খাটান হত না, বিভিন্ন নূতন ব্যবসায় শিল্পে মূলধন নিয়োগ করা হত। বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় যানবাহন ব্যবসায়, কয়লাখনি, শর্করা শিল্প প্রভৃতিতে চার্টার আইনের পরেও এদেশীয় মূলধন নিয়োগ করা হয়েছিল। যুক্তরাজ্য ও ভারতের মধ্যে বাষ্পীয় যানবাহন এবং দেশের মধ্যে নৌযান-বাহন চালু করার জন্য ১৮৩৩ সালে বাংলা দেশে আন্দোলন সুরু হয়। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, বণিক সম্প্রদায় এই ব্যাপারে যথেষ্ট অর্থ সাহায্যও করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর একটি ইংরেজ ফার্মের কয়লাখনি ৭০০০০৲ হাজার টাকায় নিলামে ক্রয় করেছিলেন। উন্নত ধরণের শর্করা প্রস্তুত ও অধিক ফ্লাক্স উৎপাদন চালু করার জন্যও তিনি অগ্রগামী ছিলেন। ১৮৪৫ সালে বোম্বের প্রেমজী কাওয়াসজী বানার্জী ভারতবর্ষে Spinning and Weaving Mills চালু করার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন। অবশ্য সরকারী সমর্থনের অভাবে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রথম কার্পাস-শিল্প কারখানার উদ্বোধন করেন কাওয়াসজী নানাভাই দারার ১৮৫৪ সালে এবং ৫০০ টাকার শেয়ারের প্রথম অর্দ্ধবার্ষিক মুনাফা ছিল ৬০০৲ টাকা।* ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত Cull-

* The first Cotton-spining factory was opened by Kowasji Nanabhai Darar in 1854 and the first halfyearly dividend was Rs. 600 for a share of Rs. 500. (Bombay Gazetteer.)

ings from Bengali Newspapers সংকলনে একথার উল্লেখ পাই যে ছোট খাট বেনিয়া (Banyans) সকল ব্যবসায়ে তাঁদের মূলধন নিয়োগ করতেন এবং এই প্রকারে তাঁদের মুনাফাও হত যথেষ্ট। কলিকাতার রামতুলাল দের উন্নতি সম্পর্কে থমাস ব্র্যাকেন সাহেবের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, ভারতীয় এজেন্সি হাউসগুলি অথবা ভারতীয় ষ্টিভেডোরদের সাথে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা কোন কারবার করতেন না, যদিও বৃটিশ এজেন্সি হাউসগুলির চেয়ে এদের হার অনেক কম ছিল। রামতুলাল দে এবং রামচন্দ্র মিত্র এতৎ সত্ত্বেও তাদের কাজে লেগেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মার্কিন ব্যবসায়ীদের সাথে কারবার করে উন্নতিলাভ করেন। সুন্দরবন সংরক্ষণের মত অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ কাজে রামতুলাল সরকার সেদিন অংশ গ্রহণ করেছিলেন।*

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে একথা সুস্পষ্ট হল, সেদিন ভারতের শিল্প বিকাশের পক্ষে তার নিজস্ব মূলধনকে ভিত্তি করে যদি যথাযথ সময়ে ভারতে যন্ত্রশিল্প বিকাশের কাজ সুরু করা যেত তবে বর্তমানে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালেও ভারতের এই শোচনীয় আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা ধন-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় ক্রমবর্দ্ধমান জনসমষ্টিকে অভাব অনটন সর্ব্বনিম্ন জীবন মানের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে দিন গুজরাণ করতে হত না। কিন্তু সেক্ষেত্রে সেদিন বিদেশী বণিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাঁদের স্বদেশীয় অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাবার তাগিদে ভারতের তৎকালীন স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে শুধু ব্যাহতই করেননি, সেই গতির মুখ ফিরিয়ে দিয়ে বিগত দিনের কৃষি অর্থনৈতিক পরিবেশ ও ব্যবস্থা পত্তনের সকল রকম প্রচেষ্টাই করেছিলেন। ফলে, সেদিন থেকেই ভারতের ভাগ্যে যে পঙ্গু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন ঘটে,

*Ramdulal Parcipated in the highly adven tures scheme of reclamation of the Sundarbans." (B. N. B. p 198).

আজও তার জের চলেছে। এ আলোচনা আমরা পূর্ব্বেই বিশদভাবে করেছি—তাই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

উপরের আলোচনার মধ্যে আমরা সেদিন ভারতের সঞ্চিত মূলধন স্বল্প ছিল এ পরিচয় পেয়েছি। একথাও সহজেই বোধগম্য, প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালী এবং সস্তা শ্রমের দেশ ভারতে সেদিন বৃহদাকার ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রয়োজন ছিল না; এবং সেদিন তা হয়ওনি, তাই সঞ্চিত মূলধন ছিল স্বল্প এবং তার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাও ছিল শিশু অবস্থায়। সেদিন ১৮৪২ সালে একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনা ও মূলধনের অবস্থা দেখে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, "লোম্বার্ড ষ্ট্রীটের লোকেরা একে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা বললে হাসবে।*

একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে সেদিন ভারতে বৈদেশিক মুলধন আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজে অগ্রদূত ছিলেন য়ুরোপীয় এজেন্সির হাউসগুলি। কারণ পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এদের সাথে অবশ্য Carr Tagore & Co. বা The Union Bank প্রভৃতি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নামও করা যেতে পারে। তবে একথা অনস্বীকার্য সেদিন এদেশে আধুনিক বৃহৎ যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠা করবার পক্ষে ভারতীয় মূলধন অতি নগণ্য ছিল; পার্শী এবং গুজরাটীরা ছাড়া অন্যান্য জাতি বা শ্রেণীর ব্যবসায় ছাড়া অন্যান্য বৃত্তির দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল। যেমন ধরুন, আমাদের কাছে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিচয় সমাজ সংস্কারক, দাতা, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক বলেই, ব্যবসায়ী বলে তেমন কোন পরিচয়ই নেই। এঁর মত অনেকেই গত শতকে ৬০ সালের পূর্ব্ব পর্যন্ত ব্যাঙ্কিং এবং বর্হির্দেশীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেদিনের প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার আর্দেশেরি কারসেটজী (ইনিই

"They would smile in Lombard Street. I fancy, at the idea of calling this Banking" (Letters to friends at Home by an Idler [Cal 1848] P—41)

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম Royal Societyর সদস্য হন, ১৮৪১) বিদেশী কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত রাখা হয় অথচ তখন ভারতীয় জাহাজ শিল্প উন্নত ধরণের ইঞ্জিনিয়ার, কারিকরের অভাবে ভেঙ্গে পড়তে সুরু করেছে।

সুতরাং দেখা গেল, ভারতের সেদিন প্রয়োজনীয় মূলধন, ব্যবসায়ী প্রতিভা এবং কিছু ব্যবসায় ছিল, অথচ পরিণামে ভারতে শিল্পের বিকাশ আর ঘটল না। এই পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতির পেছনে যে কারণ রয়েছে তার আলোচনা পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি।

আগে বলেছি, বিদেশী কোম্পানীদের নিজেদের স্বার্থে এদেশের ধন ঐশ্বর্য দিনের পর দিন প্রেরণ করে তাদের দেশে। কোম্পানী ও বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের অনুসৃত নীতি ও অত্যাচার জুলুম-বাজের ফলে এদেশের সেদিনের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস পেতে থাকে; ফলে সেদিনের সওদাগর শ্রেণীর ক্রমাগত দারিদ্র্যের ফলে, নূতন ধরণের ব্যবসায় আরম্ভকরবার মত দুঃসাহ তাঁদের ছিল না। মূলধন মূলক সম্পদ সেদিন সত্যিই বাইরে চলে যাচ্ছিল। সওদাগর শ্রেণীর মানুষেরা পূর্ব্বের চেয়ে ভীত ও উদ্যমহীন হয়ে পড়েছিলেন। আরএদেশের মূলধন ও ঐশ্বর্যের শোষণও ঐতিহাসিক সত্য, ১৮১৩ সাল অবধি কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের আমলে দেশের সম্পদ বাইরে চলে যাওয়া একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বিত্ত সেদিন ইংলণ্ডের ধনতান্ত্রিক বিকাশের শিল্পায়নের পক্ষে অর্থনৈতিক উদ্বৃত হিসাবে কাজ করেছে। ফলে, সেদিনের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা বণিকবৃত্তিবাদ থেকে ধনতান্ত্রিক বিকাশে রূপান্তরিত হল না এবং এই গতির মুখ ঘুরিয়ে অতীত দিনের কৃষিমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরের চেষ্টা হল; পূর্ব্বে আলোচিত কার-ণেও আরও কয়েকটি কারণ ছিল এর পিছনে; যদিও এগুলি বিচ্ছিন্ন নয়। দুর্গাপ্রসাদ তাঁর Foreign Trade পুঁথিতে লিখেছেন,

১৭৫৭ থেকে ১৭৭৬ সাল অবধি দেশীয় রাজাদের ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের দেওয়া বহু মূল্যবান উপঢৌকন, উপহার প্রভৃতি ইংলণ্ডে পাড়ি দেওয়া হয়েছে। আবার কোম্পানীর উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী ও কিছু ব্যবসায়ীদের সঞ্চিত বিপুল বিত্ত সেদিনের জাতীয় আয়ের পক্ষে গুরুভার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া ১৭৫৭ সালে বীজ ব্যবসায় ভারত থেকে পাঠান সোনা দিয়ে চালান হয়েছিল। ভারতে যে সব বিনিয়োগের পণ্যাদি কেনা হ'ত তা' ভারতে নিয়োজিত মূলধন থেকে কেনা হ'ত না। ভারতের দেশী ব্যাঙ্কগুলি থেকে ধার করা টাকা খাটিয়ে যে উপার্জ্জন হ'ত তা থেকে এবং দেশী ও বৈদেশিক বাণিজ্যে নিয়োজিত টাকা থেকে কেনা হ'ত। কোম্পানীর একচেটিয়া রাজত্বের ভারতে বৃটিশ মূলধন নিয়োগে কোম্পানী কোন সময়ই উৎসাহ দেয়নি।

১৮১৩ সালে এই নিয়োগ ব্যবস্থার অবসান ঘটে, কিন্তু Home Chargesএর বোঝা চাপল ঘাড়ে। Indian Finance পুঁথিতে বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, কোম্পানীর সুরু থেকে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার অবসানের কাল অবধি এই Home charges এর পরিমাণ দ্বিগুণাকার ধারণ করে, এবং আয় বৃদ্ধির ঝোঁকও পরিলক্ষিত হয়। ইহাও স্পষ্ট, সেদিনের দেশীয় ধনী বণিক সম্প্রদায়ের উপর এর একটা প্রতিক্রিয়া হবেই।

ব্যাঙ্কিং ও মূলধন পরিচালনায় পশ্চিমী Joint-stock ব্যবসায় পদ্ধতির আগমন এবং ১৮৩৩এর আইনের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজদের অবাধ আগমনের ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং সম্প্রদায়কে এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হল। প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং অসংগঠিত দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সুসংগঠিত পশ্চিমী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয়ে অবশ্যম্ভাবী হ'ল। তবে সেদিন দেশীয় মহাজন সম্প্রদায় সহজেই

পরাজয় স্বীকার করে নেননি। অনেকক্ষেত্রে তাঁরা Joint-stock ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন।

তৃতীয় কারণ হিসাবে বিদেশীর সাথে প্রতিযোগিতায় শিল্পের পতনের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। শ্রফ এবং মহাজনরা তাঁদের প্রাধান্য থেকে আধুনিক জয়েণ্ট ষ্টক ব্যবসায় সংগঠন দ্বারা বিচ্যুত হ'য়ে শিল্পে অর্থলগ্নীর ব্যাপারে একেবারেই উদ্যমহীন হয়ে পড়েন। এরা তখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ Govt-stocks এবং বিদেশী কোম্পানীর শেয়ার কিনে টাকা খাটাতে আরম্ভ করলেন, কাজেই এই অবস্থায় বৃহত্তর শিল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আশা করা অন্যায়।

এ ছাড়া, একথা পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে, পশ্চিম-ভারত ছাড়া সর্ব্বত্রই ভূমিতে মূলধন খাটাবার প্রধানতম ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগের দিনের ব্যবসায়ী কারবারী সম্প্রদায় সেদিন ক্রমশঃই জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকলেন—কর্ণওয়ালিস সাহেবের ভূমি ব্যবস্থার কল্যাণে। এই পরিবর্ত্তনের কারণও পূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে।

পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজ জীবনে যে নূতন শ্রেণী-বিন্যাস ঘটল—অর্থাৎ নূতন সৃষ্ট ভূস্বামী সম্প্রদায়, দেশীয় পুঁজিপতি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী হবে আলোচ্য বিষয়।

উনিশ শতকে ভারতের শ্রেণীবিন্যাসের বিবর্ত্তন

নূতন অর্থনীতি—নূতন শ্রেণী

১৮ শতকের শেষার্দ্ধ থেকে ১৯শতকের প্রথমার্দ্ধ কাল অর্থাৎ ইংরেজ কোম্পানীর শাসনকাল ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তরের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে। উল্লিখিতকাল ভারতে আধুনিক শিল্পযুগের পত্তন ও প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাল। এই আধুনিক শিল্পযুগের পত্তনের সাথে সাথে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ করে শ্রেণীবিন্যাসে অপরিহার্যরূপে পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

১৮ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকেই অর্থাৎ যখন থেকে ভারতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও প্রভাব প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু হয়েছিল সেই দিন থেকেই ভারতের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় ভাঙ্গা গড়ার কাজ সুরু হয় আর সাথে সাথে সমাজ জীবনেও অর্থাৎ পুরাতন শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে নূতন করে শ্রেণীবিন্যাস আরম্ভ হয়। এরকম ঘটাই স্বাভাবিক।

এই নূতন করে শ্রেণীবিন্যাসের বিবর্ত্তনে ভারতীয় সমাজ জীবনে এক নূতন শ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য, সে দিনের মুঘল রাজাদের বংশধর বা সুবাদারদের রাজস্ব কর্ম্মচারীরা এই শ্রেণী-বহির্ভূত ছিলেন। ভারতে সামন্তযুগীয় কৃষি অর্থনীতির বিকাশে কুটির শিল্পের বিবর্ত্তনের ফলে ধনী সদাগর বণিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এই গোষ্ঠি সেদিন শুধুমাত্র যে দেশীয় ব্যবসা-কারবারে মূলধন লগ্নী কর'ত তাই নয়—বৃটিশ ও পূর্ব্ববর্ত্তী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীগুলিকে এদেশে কাজ কারবারেও অর্থ দিয়ে সাহায্য করত। শেঠ, অর্জ্জুনজী, নাথজী, স্রফচেট্টি

ঠাকুরদের নিয়েই এই গোষ্ঠি। নাথজী গোষ্ঠি ১৮ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকেই ইংরাজ কোম্পানীর ব্যাঙ্কার ও এজেণ্ট ছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে ত্রিবেদী শ্রীকৃষ্ণনাথজী সরকারীভাবে কোম্পানীর স্রফ নিযুক্ত হন। তাঁরা সেই সময় দুর্গের জন্য ফরমান ও যুদ্ধজাহাজের সনন্দও পেয়েছিলেন কোম্পানীর কাছ থেকে। বাস্তবিকপক্ষে সেদিন বোম্বাইতে ফোর্বস কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অর্থ যোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়লে এই নাথজী গোষ্ঠিই সেদিনে বিদেশী বণিকদের ব্যবসা-রক্ষার একমাত্র সহায় ছিলেন। একথা আগেই বলেছি ত্রিবেদীর Rupee Loan ব্যবস্থা কোম্পানীর পক্ষে সেদিন শেষ সম্বল ছিল এবং সেই দুর্দ্দিনে এরাই কোম্পানীর সৌভাগ্য সুচনা করে।

হল্যাণ্ড তাঁর Bombay I পুঁথিতে লিখেছিলেন, ১৭৫৪ সালে লর্ড নর্থের উত্তর ভারত অভিযান কালের দুর্দ্দিনে ত্রিবেদী শুধুমাত্র মুদ্রাতেই ৩২ লক্ষ টাকা বোম্বাই কর্ত্তৃপক্ষকে ঋণ দেন। আবার ১৮১৩ সালে নেপাল যুদ্ধের খরচাও নাথজী বহন করেন—তবে সাহায্যের পরিমাণ সঠিক জানা যায় নি। টুকার সাহেব লিখেছিলেন,—১৮ শতকের সুরুতে এই শেঠ নাথজীগোষ্ঠিদের প্রভূত মূলধন ছিল (a large Capital)। এই গোষ্ঠিই এদেশে ইংরেজ আগমনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে তাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। শ্রেণী স্বার্থ-সিদ্ধির তাগিদ এঁদেরকে ইতিহাস সচেতন করেছিল—তাই দেখি জগৎশেঠ-রুস্তমজীরা নূতন অর্থনীতির প্রতিভূ ইংরেজ কোম্পানীকে এদেশে স্বাগত জানাতে ও সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হন নি। প্রাচীন সামন্ত-তান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতি তাঁদের সেদিন আর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না।

এই শেঠ-নাথজী-স্রফ-চেট্টি বণিক গোষ্ঠির কেউই কিন্তু ভূস্বামী ছিলেন না (non-feudal community)। তাঁরা জমিতে কখন

মূলধন নিয়োগ করেন নি বা তাঁদের মূলধন ভূসম্পত্তি প্রসূত ছিল না। জগৎশেঠদের কোন জমিদারী ছিল না; আর অর্জ্জুনজী নাথজীরা কোম্পানীর কাছ থেকে যে জমি পেয়েছিলেন, তা'তে কখনও টাকা খাটাননি। ডগলাস তার Bombay I পুঁথিতে লিখেছেন, Such land-grants were turned into religious endowments আর চেট্টিরা জমিব মালিক হওয়ার চেয়ে ব্যবসাদার হওয়াটাকে শ্রেয় বলে মনে করতেন।

সামন্ত-যুগের শেষভাগে তখন জমিতে টাকা লগ্নি করা বিশেষ লাভজনক ছিল না—আর বিশেষ কবে সেদিন য়ুরোপ-এশিয়ায় ভারতের কুটিব শিল্পের বাজার বিস্তৃত থাকায় অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা নিয়োগই সবচেয়ে লাভজনক। ব্যাপকতর শিল্প এবং ক্রমবর্দ্ধমান বাজার অন্যান্য বিভিন্ন ধরণেব হস্তশিল্পের বিস্তার বিত্তবান মানুষকে সেদিন আকৃষ্ট করেছিল অনেক বেশী। সেদিন শিল্পগুলি হস্তচালিত এবং ক্ষুদ্রায়তনেব ভিত্তিতে পরিচালিত হ'লেও স্থানীয় বাজারেব চাহিদার অনেক বেশী উদ্বৃত্ত থাকত এবং সেগুলি দেশে বিদেশে মোটা লাভে বিক্রয় হত। অর্থাৎ সেদিনের অর্থনীতি কৃষি অর্থনীতি থেকে অনেক দূব এগিয়ে গিয়েছিল। অর্থনীতির এই পর্য্যায়কে বণিকবৃত্তিবাদ বলা (Commercial capitalism) হয়ে থাকে। জনসাধারণের এক বিরাট অংশের জীবিকা সেদিন এই ব্যাপক কুটির-শিল্প-নির্ভরশীল ছিল আব এই সকল শিল্পোৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্যেব দেশে বিদেশে বাণিজ্যের তাগিদে সৃষ্টি হয়েছিল সেদিনের অর্থনীতিতে নূতন শ্রেণী—বণিকগোষ্ঠি। চেট্টি-স্রফ মহাজনরা প্রাক্ কোম্পানী আমলে এই সকল শিল্পে এবং কারবারে টাকা লগ্নি করত। ক্রমশঃ এই বণিক গোষ্ঠি তাদের বিপুল মূলধনের (Trades Capital) সাহায্যে দেশের ব্যাপক কুটির শিল্পের (manufacturing class) উপর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর এই উদ্দেশ্যে তারা মুর্শিদাবাদ

থেকে সুরাট এবং মূলতান থেকে মাতুরা পর্যন্ত কুঠি প্রতিষ্ঠা করেছিল। একথা আগেই বলেছি বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানী বিশেষ করে ইংরেজ কোম্পানী তাদের কারবারে এই গোষ্ঠির কাছ থেকে নানাভাবে অর্থ সাহায্য পেয়েছিল। ক্লাইভও যখন মুর্শিদাবাদে প্রথম প্রবেশ করেন, সেদিন তিনি বলেছিলেন, মুর্শিদাবাদ শহর লণ্ডনের থেকেও উন্নত ছিল। ১৮৪৪ সালে স্লীম্যান লিখেছিলেন, ভাবতের মূলধন সম্পদ যথেষ্ট ছিল। অযোধ্যায় বৃটিশ-শাসন প্রবর্ত্তনের পব দেশী ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ কবে কলিকাতাব প্রতিষ্ঠানগুলি অযোধ্যা রাজবংশকে অর্থ সাহায্য করতেন।

• অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবেব জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। অবশ্য পূর্ণ সার্থকতাব জন্য তখনও তুটি অবস্থা অপরিহার্য্য ছিল। অর্থাৎ প্রথমটি ধনপ্রাণ জীবনযাত্রায় নিবাপত্তা এবং দ্বিতীয়টি, আধুনিক যন্ত্রপাতির আমদানি। কোম্পানী আমলে মানুষের জীবনে মুঘলরাজা বা হিন্দু-বাদশাহী আমলেব চেয়ে অনেক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। অবশ্য বলা বাহুল্য এ নিরাপত্তা বিদেশী বণিক-শাসকদের বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল। কাজেই সেদিনের উঠতি নূতন অর্থনীতির সম্ভাব্য প্রতিনিধি শেঠ-নাথজী বণিকগোষ্ঠি তাদের শ্রেণীস্বার্থেই বিদেশীকে সাহায্য করেছিল—এদের উঠতি ব্যবসায় কারবার প্রসারে নিরাপত্তা অপরিহার্য্য ছিল। দ্বিতীয় প্রয়োজন অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করার কাজে কোম্পানীরাজের কোন সাহায্যই পাওয়া যায় নি। বরং সকলপ্রকার প্রচেষ্টাকে নিষ্ঠুর-ভাবে বিরোধিতাই কোম্পানীরাজ করেছে। সেদিন যুক্তরাজ্য থেকে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করা কড়া বাণিজ্য শুল্কের সাহায্যে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও সেদিন এদেশের কুঠির শিল্পকে নানাপ্রকার শুল্ক আইন ও সরকারী জুলুমের সাহায্যে গলাটিপে

মেরে ইংরেজ এদেশে তার শিল্পের তৈরী মালের বাজার প্রস্তুত করেছিল। তার ফলে এই বণিকদের অনেকেই কোম্পানীর শাসন প্রবর্ত্তিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় পুরাতন বৃত্তি-চ্যুত হয়! কুটিব ও হস্তশিল্পের পতনের ফলে কারিগরদের জন্য সদাগর ব্যবসায়ীদেরকেও বৃত্তিহীন কবেছিল। ব্যাপক-কুটির শিল্পের ধ্বংসেব মাধ্যমে সেদিন বণিক মূলধন নিয়োগেব ক্ষেত্র সম্পূর্ণই প্রায় বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।

এখানেই শেষ নয়। এদেশে যাদেব সাহায্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদেব ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল, রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের সাথে সাথেই এদেশেব স্বার্থসিদ্ধিব উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারেব সেদিনেব বণিক-মূলধনের প্রতিনিধি শেঠ-চেট্টি স্রফ গোষ্ঠিদের অগ্রগতি ব্যাহত করতে সেই কোম্পানী দ্বিধা বোধ করেন নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিরঙ্কুশ অধিকাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী ভূমিনীতির প্রলোভন দেখিয়ে সেদিনেব বিত্তবান মানুষদের শিল্প-ব্যবসা বাণিজ্যেব ক্ষেত্র থেকে অপসাবণের চেষ্টা করেন। এই ভূমিনীতিব মাধ্যমে সেদিন নূতন Landed aristrocracy-র সৃষ্টি করা হয়। আর বণিক গোষ্ঠিও অনেকেই তখন কৃষিতে টাকা লগ্নি করে কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

তাই ১৮ শতকের মাঝামাঝি কালে শেঠ-চেট্টি-স্রফ-নাথজী বণিক গোষ্ঠিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে প্রাধান্য ও সুপ্রতিষ্ঠা দেখা গিয়েছিল, ১৮৩৩ সালের সনদ প্রবর্ত্তনকালে দেখা গেল সেই প্রাধান্য স্তিমিত হয়ে এসেছে।

কোম্পানী আমলের অব্যহিত পূর্ব্বে দেশের ভুস্বামী জমিদারগণ অপদার্থ "a race incorrigible", সংশোধন বহির্ভূত সম্প্রদায় বলে গণ্য হত। অথচ কোম্পানীর দেওয়ানী আমলের সুরু হওয়ার সাথে সাথে কোম্পানী এই ভূস্বামীদের আশ্রয় করে দেশের রাজস্ব

সংগ্রহের কাজে হাত দেয়। সমসাময়িক একজন সাংবাদিক গোলাম হোসেন খাঁ এই জমিদার গোষ্ঠির সম্পর্কে লিখেছিলেন, সেদিন এদেশের বুদ্ধি-বৃত্তি-বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তি ও রাজাদের এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল, এই সকল জমিদারদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মূঢ়তা। এরা সকল সময় স্বার্থসিদ্ধিকেই সবচেয়ে বড় কাজ বলে মনে করত। এই শ্রেণীই কোম্পানীর নূতন নীতি অনুযায়ী সামাজিক প্রাধান্য লাভ করেছিল। অবশ্য ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে লোভ ও দুর্নীতির জন্য এরা কুখ্যাত হয়ে পড়ে। ১৭৮০খ্রীষ্টাব্দে সাংবাদিক গোলাম হোসেন খাঁ কোম্পানীর আমলের প্রারম্ভে বাংলা দেশের ঐশ্বর্য্যে যে ভাঙ্গন ধরেছিল, সে সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন নীতিহীন অপদার্থ এবং পূর্ব্বে ক্ষমতাবিহীন এই জমিদারদের অত্যধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অত্যধিক বিশ্বাস করাই এই পতনের জন্য অনেক দায়ী। এই প্রকার ভূস্বামী গোষ্ঠীকেই ইংরাজরা বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালী করে তোলে। কারণ ইংরেজ বুঝেছিল, এদেরকে দিয়ে তাদের শিল্পের জন্য কাঁচামালের সরবরাহ এবং তাদের দেশের শিল্প-প্রস্তুত পন্যের বাজার তৈরী করার কাজ সম্ভব হবে অথচ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন শঙ্কা নেই। বণিকগোষ্ঠির কাছ থেকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার শঙ্কাই তারা করেছিল। তাই সেদিন কোম্পানীর অনুগৃহীত, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এবং কখনও কখনও অনুগৃহীত বণিককেও জমি দান করে প্রভাবশালী জমিদার পরিণত করাও হয়েছে। জগৎ শেঠ গোষ্ঠি যখন শাসক-গোষ্ঠির প্রতিকূলতায় পতনের সম্মুখীন হয়েছে তখন একজন সাধারণ পশম ব্যবসায়ীকে প্রচুর জমি দেওয়া হয়েছে এমন নজিরও আছে। মুর্শিদাবাদ গেজেটে লেখে, কাশিমবাজার প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ছিলেন সাধারণ একজন পশম ব্যবসায়ী। পরে কোম্পানীর অনুগ্রহে ব্যবসা ছেড়ে কাশিমবাজার এষ্টেট প্রতিষ্ঠাতা করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসাবে জমি প্রদান

কয়া সরকারী নীতি হয়ে দাঁড়ায়। নব-কিষেণ ছিলেন হেষ্টিংসের মুন্সি। এই মুন্সিকেই এক বিরাট জমিদার করে দেন এবং তিনি শেষে মহারাজ উপাধি পান। আর সেদিন নব-কিষেনই ছিলেন কলিকাতার একমাত্র জমিদার। চৈৎসিং ঘটনার কালে অর্থ ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করার পুরস্কার হিসাবে কোম্পানী কাশীর একজন ব্যাঙ্কার কাশ্মীবীমলকে জায়গীব প্রদান করেন। এরপরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমি-নীতির সাহায্যে ব্যাপক চিরস্থায়ী জমিদার গোষ্ঠির সৃষ্টির কাজ সুরু হয়। এই গোষ্ঠির উপর কোম্পানী সেদিন তাব রাজত্বের অস্তিত্ব বজায় রাখার ভরসা করেছিল। সেদিন জমিদাব শ্রেণীকে সরকাবী কাজকর্ম্মেও এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া হত যে ১৯ শতকেব সুরুতেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব এলাকাগুলিতে ছোট বড় তৌজী, মহল্লা ক্রয় কবাটা সেদিনের বিত্তবান লোকদেব কাছে খুব বড় একটা আকাঙ্খা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অর্থাৎ সেদিন এই প্রকারে বিত্তবান ও কাববারী ব্যবসায়ী মানুষদের জমির দিকে আকৃষ্ট করে এনে ব্যবসায় বাণিজ্যের এলাকাটা নিরঙ্কুশ করার চেষ্টা চলে, এবং সেই নিরঙ্কুশ এলাকাটি বিলাতি শিল্পপতিদের জন্য সুবক্ষিত কবার চেষ্টাও চলে। সেদিন কুটির শিল্পের পতন এবং জমিতে মানুষের ভীড় বৃদ্ধির ফলে বিত্তবান কাঁচা টাকাওয়ালা মানুষদের পক্ষে জমিদারি ও সাথে সাথে মহাজনী বৃত্তি একটা লাভজনক জীবিকা হয়ে দাঁড়ায়। এইপ্রকারে বৃটিশ বণিকদের এদেশে ব্যবসা কারবার বিস্তারের পক্ষে অন্যতম প্রতিবন্ধক ও প্রতিযোগীকে পথ থেকে সরাবার ব্যবস্থা করা হ'ল। আর ক্রমশঃই এই জমিদারী এত লাভজনক ও সম্মানজনক বৃত্তি হিসাবে গণ্য হতে থাকলে যে ১৯শতকের ৩।৪ দশকে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে জমিদার সমিতি গড়ে ওঠে। ১৮৩৭ সালে The Zemindary Associa-

tion, ১৮৩৪ এ Bengal British Indian Society প্রতিষ্ঠা এবং পরে এই দুইটি সংগঠন একত্রিত হয়ে ১৮৫১ সালে British Indian Association গঠন করার ইতিহাস আমাদের জানা আছে।

কর্ণওয়ালিস সেদিন শুধু তাঁব ভূমিনীতির সাহায্যেই সেদিনের কাঁচা টাকাওযালা বিত্তবান মানুষদেব ভূমিমুখী করার চেষ্টাতেই ক্ষান্ত হন নি—তিনি শাসন সংস্কার নীতির সাহায্যে ভারতীয়দের সকল প্রকার সবকারী উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত করেন যাতে এই সকল পদেব জন্য যোগ্য ব্যক্তিবাও তাঁদের বুদ্ধি, বৃত্তি, ক্ষমতাকে জমিতে নিয়োগ করে। উদ্দেশ্য ছিল, ভারতেব কৃষি সম্পদকে Workshop of England এর জন্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা। এছাড়াও আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। ভারতবর্ষকে সেদিন কোম্পানী তাদেব দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের dumping ground হিসাবেও ব্যবহাব করতে চেয়েছিল। দেশের শাসন ও বিচার বিভাগে ওদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মোটা বেতনে জীবিকার ব্যবস্থা করাও প্রথমে কোম্পানী ও পার্লামেন্টের উদ্দেশ্যে ছিল। এদেশে সরকাবী কাজ কর্ম্মের মধ্য দিয়ে এদেশে ওদেশবাসীর সাথে পরিচিত হওয়া ও পরে মোটা বেতনের সঞ্চিত অংশকে এদেশেই নিয়োগ করা সেদিনের পার্লামেণ্ট ও কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেদিন Holt Mackanzie পার্লামেণ্টারী কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "I am not very sanguine as to the introduction of capital by direct remittance though it may be done to a certain extent by commercial speculation employing agents……there seems to be great scope for men of education, good character and industry. Every European of suitable qualification, character and industry who landed in

Bengal, if "befriended and supported" for a short-time would, I think, become a capitalist by force of that character and industry ; at the same time, speculators from home might also send out capital (pp, 735-11 of 1831-32 p. 109). অবশ্য সরকারী চাকুরী থেকে খুব বেশী দিন এ দেশীয়দের বঞ্চিত করে রাখা যায়নি। অভিজাত জমিদার-ভূস্বামী পরিবারের সমর্থন ও সহানুভূতি বিদেশী শাসকদের প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যে এই সব ভূস্বামী রাজা জমিদারদের পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়দের সরকারী চাকুরীতে কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থার কথাও ইংরেজরা ভেবেছিলেন। তাই দেখি, ১৮৩৩ এর চার্টারের ৮৩নং দফায় জাতি-ধর্ম্মনির্বিশেষে উচ্চ শিক্ষিত ভারতীয়দের সরকারী চাকুরীতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য বলাবাহুল্য খুব উচ্চ ও দায়িত্বশীল পদে এদের নিয়োগ করা হয়নি এবং বেতনের তারতম্যও ছিল ভারতীয় ও ইংরেজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে। সেদিন অনেক শিক্ষিত যুবকই সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করেন—রাজা রামমোহনের পালিত পুত্র রামপ্রসাদের নাম এঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য রাজা জমিদার পরিবারভুক্তদের সন্তানদের মধ্য থেকেই এই নিয়োগ করা হয়, যাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করার ছিল না এবং যাদের পরিবারের সমর্থন সেদিন ইংরেজ শাসকরা প্রয়োজনীয় বলেই গণ্য করতেম। এই আলোচনা থেকে সেদিন ভারতীয় সমাজে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি। আবির্ভাবের পুরো পরিচয় পরবর্ত্তী বিশদ আলোচনায় মিলবে বলে আশা করি।

১৯ শতকের ৩০।৪০ দশকের শেষে যখন ইংরেজী বিদ্যালয় খোলা হ'ল এবং ইংরেজীনবীশ না হলে সরকারী চাকুরী এবং সরকারী ইংরেজ সমাজে ঠাঁই মিলবে না বলে উপলব্ধি করা গেল

তখন ভাবতীয়দের স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজী শিক্ষা ও সরকারী চাকুরীর প্রতি ঝোঁক দেখা গেল। অবশ্য এই প্রবণতার পেছনে এই দুটি কাবণই যথেষ্ট ছিল না—সেদিন য়ুরোপীয় শিক্ষায় যে নূতন জীবনবাদের ইঙ্গিত ছিল সেই জীবনবাদেব আদর্শও ভারতীয় শিক্ষিতদেব আকৃষ্ট কবেছিল। আর এবাই সেদিন ভারতীয় সমাজ মানসে রেণেসাঁব আহ্বায়ক; বামমোহন, ভূদেব, কেশব, বঙ্কিম, ডিবোজিও, বামতনু, বিদ্যাসাগর—এঁবাই সেদিন এই নূতন আলোড়নেব পুবোধায় ছিলেন। অবশ্য সে আব এক ইতিহাস।

লর্ড বেণ্টিঙ্কেব আমলে এদেশেব মধ্যে থেকেই ডেপুটি কালেক্টরের পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। এ কথা আবার না বললেও চলে অভিজাত রাজা জমিদাব ভূস্বামী বংশোদ্ভুতদের মধ্যে থেকেই এই নিয়োগ করা হত। লর্ড অ্যাকল্যাণ্ডের শাসনকালে সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়, একজন ভারতীয়ের হাতে একটা গোটা জিলাব শাসনভাব ন্যস্ত করেছে। তিনি হলেন রাজা রামমোহন বায়েব পুত্র বামপ্রসাদ। এও নজিব পাই দ্বারকানাথ ঠাকুব ভাবতীয়দেব মধ্যে থেকেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের দাবী কবেন (Mitra: Memories of Dwarkanath Tagore)। অবশেষে ১৮৪৩ সালে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের ভাবতীয়দের মধ্যে থেকেই নিয়োগের ব্যবস্থা হয় (Act XY of 1893) এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্তন করেন। এ থেকে ভারতে উঠতি মধ্যবিত্ত, বুর্জ্জোয়া শ্রেণী মনোভাবের বিকাশ ঘটছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোম্পানীর চাকুরীতে সেদিন ভারতীয় নিয়োগের নীতি গ্রহণের মূলে ছিল, স্বল্প বেতনে ভারতীয় নিয়োগ করে শাসনখাতে খরচ কমান। লর্ড বেণ্টিকের আমল থেকে সুরু হয় ভারতীয়করণ। তবে বড় বড় চাকুরীগুলি কিন্তু শাসকবর্গ তাঁদের দেশের লোকের

জন্যেই রেখেছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, কেরাণী প্রভৃতি পদে অল্প বেতনে ভারতীয় নিয়োগ আরম্ভ করেন লর্ড বেন্টিক। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেদিন শাসনখাতে খরচ কমান। নইলে এই সকল পদের জন্যেও যদি বেশী বেতনে ইংলণ্ড থেকে লোক আমদানী করতে হয়, তবে কোম্পানীকে শাসন-খাতের খরচ বহন করতেই দেউলিয়া হতে হবে। তাই ভারতীয়-করণ নীতি সম্পর্কে বোগলার তাঁর Bentinc পুঁথিতে লিখেছিলেন, ভারতের শাসন ব্যবস্থা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মনোনীত প্রতিনিধির একচেটিয়া অধিকারে রাখার ঝোঁকে দেউলিয়া হয়ে যেত।* এইজন্যেই তিনি স্বল্প বেতনে উচ্চপদস্থ ভারতীয় নিয়োগ করে শাসনখাতে খরচ কমাতে চেয়েছিলেন। এই কারণে সেদিন তিনি ইংরেজ সিবিল সার্ভেণ্টদের বিরাগভাজন হন এবং তাঁরা তাঁকে ছাঁটাই প্রভূ বলতেন। আর যে বেতনে এই সকল পদে ভারতীয় নিয়োগ করা হত সে বেতনে কোন ইংরেজ এদেশে চাকুরী করতে আসত না। সিভিলিয়ান হল্ট ম্যাকেন্‌জি ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সাহায্যে ছোটখাট চাকুরীগুলিতে ভারতীয় নিয়োগের নজির দেখিয়ে ১৮৩১—৩২ সালে পার্লামেণ্টারী কমিটিতে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, কোম্পানীর বিভিন্ন চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ করলে ভারতের আথিক অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে। আর এই ভারতীয়রা ইংরেজদের চেয়ে বুদ্ধি-বৃত্তিতে খাট নয়। এছাড়াও আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল, দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার, আশা আকাঙ্খার সাথে পরিচিত হবার তাগিদও ছিল যাতে নিজেদের ব্যবসায় বাণিজ্য রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এদেশের জীবনযাত্রা, ভাষার সাথে

* ......a persistance in keeping the administration of India as an exclusive monopoly for the nominees of East India Company would have ended in bankruptcy (p—159).

সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশ থেকে আনা নূতন সাহেব কর্ম্মচারীদের দিয়ে একাজে এগোন যাবে না—কোম্পানী তা বুঝেছিল। সেদিন কোম্পানীর এই নীতির ফল সম্পর্কে পার্লামেণ্টারী কমিটিতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল * যে ভারতীয়দেরকে য়ুরোপীয়দের অধীনে উচ্চপদে নিয়োগ করলে তাদের নৈতিক চরিত্রগত উন্নতি ঘটবে ; বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে এবং ভারত সরকারের ব্যয় হ্রাসের সাহায্যে সঞ্চয় ঘটবে।

যদিও ৩৩ এর সনদে বলা হয়েছিল, "No native of the said territories (India) nor any natural born citizen of his majesty resident therein, shall by reason only of relegion, place of birth, descent, colour or any of them, be disabled fr m holding any place, office or employment under the said company." কিন্তু উচ্চ পদগুলি ও অন্যান্য পদগুলির পার্থক্য বজায় রাখা হয়েছিল এবং পুরাতন পদ্ধতিতে চাকুরীতে নিয়োগ ও Hailyburyতে শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত রইল। য়ুরোপীয়দের সেদিন ৩৩ এর সনদ অনুযায়ী ভারতে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকায় নন্-গেজেটেড পদগুলির জন্য প্রার্থী হতে পারত। ফলে খুব উঁচু পদে ভারতীয় নিয়োগ হত না বললেই চলে।

কাজেই সেদিন অভিজাত, উচ্চশিক্ষিত, উঠতি মধ্যবিত্তদের থেকে উচ্চতর পদে নিয়োগের দাবীতে আন্দোলন সুরু হয়। ১৮৩১ সালে রামমোহন লিখেছিলেন, শিক্ষিত, উৎসাহী ও উদ্যমশীল

* "it is contended that their admission under European control into higher offices would have a beneficial effect in correcting the moral oblipuites of their general characters, would strengthen their attachment to British Empire, would conduce to the latter administration of justice and would be productive of aggregate saving in the expences of India Govt."

ব্যক্তি এবং চলতি শাসন ব্যবস্থায় বিপর্য্যস্ত অভিজাত শ্রেণীর বংশধর গণ সেদিন সরকার পক্ষ থেকে নির্দ্দিষ্ট ছোটখাট সরকারী পদে নিয়োগকে অবমাননা জনক বলে মনে করতেন।"*

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে, তৎকালীন হিন্দু কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩৫ সালের জানুয়ারীতে এক জনসভায় পূর্ব্বে উল্লিখিত Hailbury collegeএ য়ুরোপীয়দের এদেশের বিভিন্ন কর্ম্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা দেওয়া হত তার অবসান দাবী করেন। তিনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষই ভারতে চাকুরীর জন্য শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ থেকে এ কথা মেনে নেওয়া চলে ভারতীয় সমাজ মানসে মধ্যবিত্ত বুর্জ্জোয়া মানসের সেদিন বিকাশ সুরু হয়েছে। তাই একথাও সত্য সেদিনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগের দাবীতে যে আন্দোলনের সুরু হয়েছিল—সেই হল আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত যার পরিণতি ঘটে প্রায় ৫০ বছর পরে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায়।

সেদিনের জমিদার ভুস্বামী শ্রেণীর লোকদের মধ্যে থেকেই সাধারণতঃ কোম্পানীর বিভিন্ন চাকুরীতে লোক নিয়োগ করা হত। কারণ কোম্পানীর প্রতি এই সমাজের বিশ্বস্ততা সেদিন অন্তত সন্দেহের বস্তু ছিল না। কাজেই শিক্ষা বিস্তারের সুরু হয় এই সমাজের মধ্যে। অর্থাৎ সেদিন ভারতীয় সমাজে নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের পতন ঘটল যাঁরা তখনও তাদের জীবিকার জন্যে ছিলেন ভূমি নির্ভর আর য়ুরোপের নূতন আদর্শে ছিলেন অনুপ্রাণিত এবং বার্ক-বেন্থাম-রুশোর ভাষায় কথা বলতেন ও কোম্পানীর বড় বড় আমলাতান্ত্রিক পদের জন্যে আকাঙ্খা ও আন্দোলন করতেন।

---

* Men of aspiring character and members of such ancient families much reduced by the present system considered humitiating to accept the triffling public sitoatiou which native are allowed to hold under British Govt. and are decidedly disaffected to it (English works of Raja—P 300).

সেদিনের এই সমাজের আদর্শের নেতৃত্বের দিক দিয়ে রাজা রামমোহন ছিলেন পুরোধায়। প্রচলিত বিগত সমাজ জীবনের আদর্শের আর ঠাঁই নেই—একথা য়ুরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা রামমোহন বিশেষ করেই উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি এদেশের শিল্প পত্তনের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন। এঁদের দুজনের চিন্তাধারা ভাবভাবনার মধ্য দিয়ে সেদিনের ভারতীয় সমাজের নূতন শ্রেণী বিবর্ত্তনের আদর্শ মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, Female Infanticide রহিত ও পশ্চিমী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে এই সমাজের সেদিন কোম্পানীকে সোৎসাহ সমর্থনের মাধ্যমে অতীতের সনাতন জীবন যাত্রার সাথে বিচ্ছেদ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ফলে বিশেষ করে, পশ্চিমী শিক্ষার প্রসারতায় ধর্ম্মের গোঁড়ামি, অন্যান্য কুসংস্কার এবং জাতিভেদ প্রথায় বিশেষ আঘাত লাগে ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মৌলবীদের সমাজ জীবনে যে প্রাধান্য ছিল তা বিশেষ ভাবে ক্ষুন্ন হয়।

১৮৪২ সনে ফিসারের Colonial Magazine দ্বারকানাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন, ১৮৩৪ সালে যখন কলকাতায় বহু বড় বড় ব্যবসায়ের হৌসগুলি (বণিক প্রতিষ্ঠান) সহসা পতনের ফলে কলিকাতার বাণিজ্যিক লগ্নি কারবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং সাথে সাথে ইংলণ্ড ও ভারতের অন্যান্য স্থানে আরও কতকগুলি হৌসের বিপর্য্যয় ঘটে সেই সময় দ্বারকানাথ তাঁর সবিশেষ বন্ধু লর্ড বেন্টিঙ্কের উপদেশ ও পরামর্শে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পত্তন করেন। এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাথে য়ুরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ স্থাপন করেন! এই প্রসঙ্গে সেই কাগজ আরও লিখেছেন—Until Dwarakanath took this stepno Hindoo had ever been known to be engaged in commerce by way of sea with the

foreign countrees ···it is to Dwarakanath and the wisdom which he has shown in carrying but his enlightened plan that we shall have to trace the commencement of a new era in the affairs of India. এই উক্তির মধ্যেই সেদিনের ভারতীয় সমাজ জীবনের উঠতি নূতন শ্রেণী ও সেই শ্রেণীসুলভ মনোভাবের পরিষ্কার পরিচয় রয়েছে। ভারতীয় সমাজ জীবনের চলতি ও পরবর্ত্তী অধ্যায় এই শ্রেণীই যে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে তা পরিস্ফুট। লর্ড বেন্টিঙ্কের বন্ধু হলেও সেদিনের উঠতি নূতন শ্রেণীর প্রতিভূ দ্বারকানাথ একথা বলতে পিছপাও হননি, বৃটিশরা এদেশের সব কিছুই গ্রাস করেছে— তাদের জান-মান-সম্ভ্রম-সম্পত্তি সব কিছুই সরকারের দয়া ও মর্জ্জির ওপর নির্ভর করে। তিনি সেদিন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ভারতের প্রত্যেকটি প্রেসিডেন্সি থেকে প্রতিনিধি পাঠাবার দাবী করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দ্বারকানাথের সেই দিনেও গভর্ণর জেনারেল প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি এবং ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি গ্রহণে অসম্মতি জানাবার মত মানসিক বলিষ্ঠতা ছিল। এই মনোভাবের মধ্যেই তাই সেদিনের উঠতি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুলভ জাতীয়তাবাদের প্রথম বলিষ্ঠ পরিচয় মেলে।

অবশ্য তাঁর ইতিহাস সম্মত দৃষ্টি ভঙ্গীর অভাব ছিল না। তাই সেদিনের পৃথিবীর নূতন জীবনাদর্শ ও যন্ত্রশিল্প-গত অর্থনীতির অগ্রদূত ইংলণ্ডের সাথে ভারতের সুখ সমৃদ্ধির পথ বাঁধতে হবে একথাও তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। ইংলণ্ডের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতের চিন্তাশক্তি এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রগতি গড়ে তোলা যাবে বলে তিনি মনে করতেন এবং সেইজন্যে ইংলণ্ডে তাঁর ভ্রমণকালে একজন দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনকারীকে বাংলার যুবশক্তিকে রাজনৈতিক আন্দোলন ও ভাবধারায় শিক্ষিত করার মানসে স্বদেশে নিয়ে আসেন। এই-

সকল ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা সেদিন ভারতের উত্তরাঞ্চলের বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ও উক্তশ্রেণীসুলভ মনন—কার্য্যাবলীর পরিচয় পাই।

পশ্চিম ভারতে এই পরিপ্রেক্ষিতে পার্শী ও গুজরাটিদের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। বহুদিনের সামুদ্রিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত পার্শীরা ১৯ শতকের মাঝামাঝি কালে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী সমাজ বলে গণ্য হত। শোনা যায় বিশপ হেবরের সময় থেকে ওদের মধ্যে একজনও ভিখারী পাওয়া যায়নি। পশ্চিমের শিক্ষাকে পার্শীরা সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং শুধু তাই নয়, বোম্বাইয়ে বড় বড় অনেকগুলি ইংরেজী স্কুল জামশেদজী জিজাভাই এর অর্থে গড়ে উঠেছিল। যন্ত্রশিল্প বিকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক ধর্ম্মীয় বা অন্যকোন প্রকারের কুসংস্কার এদের মধ্যে সেদিন ছিলনা এবং রাজা, জমিদার হওয়ার প্রতিও এদের কোন লোভ বা মোহ ছিল না। কাজেই বলা চলে বিত্তশালী পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত পার্শীরাই সেদিন ভারতে যন্ত্রশিল্প বিকাশের কাজে যোগ্যতম ছিল। আর তাছাড়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এদের অভিজ্ঞতার শিক্ষাও ছিল যথেষ্ট। ক্যান্টন থেকে লণ্ডন অবধি রুস্তমজী বা জামশেদজীদের মত শীর্ষস্থানীয় পার্শী ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় বিস্তৃত ছিল এবং সেই সুযোগে চীনের সেদিনের কৃষি অর্থনীতি ও ইংলণ্ডের বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রভেদও তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হল, আর সব দিক দিয়ে উপযুক্ত হলেও পার্শী সম্প্রদায় সেদিন কোন সময়ের জন্যেই নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করতে চাইত না। ভারতের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই বড় করে দেখেছে বলে প্রথমদিকে তারা ভারতের শিল্প প্রসারের দিকে না গিয়ে শাসক শ্রেণীর সাথে হাত মিলিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ এবং ভারতকে বৃটেনের শিল্পের পণ্যের বাজারে পরিণত করার নীতিকেই পুষ্ট

করেছে। তবে ১৯ শতকের শেষার্দ্ধে অবশ্য জামশেদজী টাটা এবং দাদাভাই নৌরজীদের মত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ও প্রভাবে এই সম্প্রদায়ের মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে।

১৯ শতকের শেষভাগে পার্শী ও গুজরাটীরা বড় বড় কাপড়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য ১৯ শতকের ৪০ দশকেই গুজরাটীরা প্রাধান্যে আসেন। গুজরাটীরা সেদিন কার্পাস বিক্রীর ব্যবসাও করেন। দাস প্রথা বিরোধী আন্দোলন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তর থেকেই ম্যানচেষ্টার তার প্রয়োজনীয় কার্পাস সংগ্রহের চেষ্টা করায় কার্পাস ব্যবসায় একটি আন্তর্জ্জাতিক পণ্য হিসাবে গণ্য হয়। সেদিন বেশ কয়জন গুজরাটী পরিবার কার্পাসে ফাটকা খেলে প্রচুর বিত্তলাভ করেন। P. R. S. বৃত্তির প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের পিতা রায়চাঁদ দীপচাঁদ এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব সম্পর্কে মোটামুটি পরিচয় নেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমান আলোচনায় এই বিকাশের অনুসঙ্গী যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাব সম্পর্কে গুটিকতক কথা বলেই এই সুদীর্ঘ আলোচনার সমাপ্তি টানব।

১৮৫৩ সালে কার্লমার্ক্স নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে "ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল" প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "আমি জানি যে বৃটিশ মিল মালিকেরা কেবল নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের জন্য কম খরচে তুলা এবং অন্যান্য কাঁচা মালের আশাতেই ভারতে রেলপথ স্থাপন করতে চায়। কিন্তু যে দেশে লোহা ও কয়লা রয়েছে, সে দেশের যানবাহন ব্যবস্থায় একবার যন্ত্রের আমদানী করলে সেখানে যন্ত্রপাতি তৈয়ারী আর রোধ করা যাবে না। সেইজন্য রেলপথই হবে ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।"

ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বিকাশের পরবর্ত্তী ধারায় মার্কসের এই

কথা কয়টির সত্যতার প্রমাণ রয়েছে। ভারতের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই রেলপথ সেদিন এক যুগান্তর এনে দিয়েছিল। সেদিন রেল স্থাপনের ভার পড়েছিল আটটি বেসরকারী কোম্পানীর উপর। কিন্তু আর্থিক কোন ঝুঁকি ছিল না। ভারত সরকারের সাথে তাদের যে চুক্তি হয়েছিল, তা'তে বলা হল, রেলপথ করতে কোম্পানীগুলির যত জমি লাগবে—তা' তারা বিনা মূল্য পাবে। আর যে পরিমাণ মুলধন তারা লগ্নী করবে তার উপর বছরে শতকরা ৫৲ টাকা সুদের গ্যারান্টি সরকার দেবেন। আর যদি ব্যবসাতে লাভ না হয় তবে রাজকোষ থেকে সুদের অঙ্ক পুষিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য বলা বাহুল্য এই চুক্তির ফল হয়েছিল অত্যন্ত মারাত্মক।

প্রাক্তন অর্থসচিব ডব্লিউ, এন, ম্যাসি লিখেছেন, "ঠিকাদারদের ব্যয় সংকোচ সম্বন্ধে কোন মাথা ব্যথাই ছিল না। সব টাকাই আসছিল ইংরেজ ধনপতিদের কাছ থেকে এবং যতক্ষণ ভারতের রাজস্ব থেকে শতকরা ৫৲ টাকা সুদের গ্যারান্টি থাকছে ততক্ষণ তাদের ধার দেওয়া টাকা হুগলী নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হোক কিংবা ইট চূণ সুরকিতেই পরিণত হোক, তাদের কাঁছে সেকথার কোন মূল্যই ছিল না।…আমার মনে হয়, এই সব কাজে যত অর্থ বাজে নষ্ট হয়েছে, তেমন আর কোথাও হয়নি।" সেদিনে কোম্পানী-গুলির নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ মেটাতে ১৮৫২ সন থেকে ১৮৬৯ সন পর্য্যন্ত ভারতসরকারের তহবিল থেকে ১কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। ১৮৭৩ সন পর্য্যন্ত যে ৬ হাজার মাইল রেলপথ তৈয়ারী হয়েছিল তার জন্য সরকারের খরচ হয়েছিল ১০০০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ মাইল প্রতি ১৬ হাজার পাউণ্ড।

তা' সে যাই হোক্—তবু রেলপথ বাঁধা হয়েছিল। রমেশ দত্তের Economic History of India পুঁথিতে সেদিনের রেল পথের প্রসারের মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়।

১৮৫৩ সন	—২০	মাইল
১৮৫৬ ,,	—২৭৩	,,
১৮৫৭ ,,	—২৮৮	,,
১৮৬১ ,,	—১৮৮৮	,,
১৮৮২ ,,	—১০,১১৪	,,
১৮৯২ ,,	—১৭,৮৯৪	,,
১৯০০ ,,	—২৪,৭৬০	,,

অবশ্য গ্যারান্টি ব্যবস্থার ফলে ক্ষতির পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে শেষ অবধি ভারত সরকার কয়েকটি রেলপথ পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আরও ক'টা কথা বলা দরকার। সেদিন শুধু সুদ বাবদেই ইংলণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা পাচার হয়নি, ইঞ্জিন, বয়লার, যাত্রীগাড়ী, মালগাড়ী রাসায়নিক দ্রবাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলিও ইংলণ্ড থেকেই আসত—ফলে ওদের দেশের ভারী শিল্পপণ্যের বাজার প্রসারিত হ'তে থাকে—এ দেশে ইংরেজ অর্থনীতির উদ্দেশ্যও তাই ছিল।

রেলযুগের সার্থে সাথেই দেখা গেল, বৃটিশ পণ্য রেলপথ ধরে ভারতের সর্ব্বত্র যাতায়াতের উদ্যোগ করেছে—আর ভারতেরও কাঁচা মাল রেলপথ ধরে ছুটে চলল ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে বন্দরের অভিমুখে। ইংরেজদের এদেশে আগমনের মূল উদ্দেশ্য সফল হতে চলল। এ. কে. কোনেলের বই Economic Revolution and Public Works Policyতে উল্লিখিত হয়েছে—"চা, কয়লা এবং অনুরূপ শিল্পের কল্যাণেই রাস্তা, সেতু ও রেলপথ জনসাধারণের অর্থে নির্ম্মিত হয়েছে।" রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল—সিপাহী বিদ্রোহ শাসকদের চোখ খুলে দিয়েছিল। কাজেই শাসনের খাতিরেও দেশকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধার প্রয়োজনও তাঁরা অস্বীকার করতে পারেনি। রেলপথের মাধ্যমে খাদ্য চলাচল ব্যবস্থায়

সাহায্য করার যে রব তোলা হয়েছিল সেদিন—তা' হ'ল রেলপথ স্থাপনের ফল—কারণ নয়। কারণ আগেই বলেছি।

রেলপথের সাথে সাথে রাস্তাও তৈয়ারী হয়—তাই স্বাভাবিক। যে বাণিজ্যিক প্রয়োজন এদেশে রেলপথের জনক সেই প্রয়োজনই আধুনিক রাস্তারও জনক। উনিশ শতকের গোড়াতে ম্যাকডাম ধাতু নির্ম্মিত রাস্তা নির্ম্মাণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সেই ম্যাকডাম পদ্ধতিও এদেশে অনুসৃত হ'ল। কলকাতা থেকে দিল্লী অবধি বিস্তৃত গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ১৮৫৩ সালে তৈয়ারী হয়। ১৯ শতকের শেষভাগে ৩৭,০০০ হাজার মাইল ধাতু নির্ম্মিত পথ এবং ১৩৬,০০০ হাজার মাইল কাঁচা ইট সুরকীর পথ তৈয়ারী হয়েছিল।

ভারতীয় বৃহৎ যন্ত্রশিল্প বিকাশে এই পরিবাহন ব্যবস্থায় বিপ্লবের কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল? প্রথমতঃ কুটির শিল্প-গুলিকে শেষ আঘাত হেনে নবনির্ম্মিত কাপড়ের কলগুলির জন্য বাজার তৈরী সম্ভব হয়েছিল। আর কাপড়ের কলগুলির পক্ষে দেশের অভ্যন্তরে মাল পৌঁছে দেওয়া এবং বিদেশে মাল রপ্তানী করা সহজ হ'ল।

আগেই বলেছি, পার্শী ও গুজরাটী ব্যবসায়ীরা এদেশে ১৯ শতকের শেষভাগে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রেলপথের সাথে সাথে কাপড়ের কলগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল—

	১৮৭৯—৮০	১৮৮৪—৮৫	১৮৮৮—৯০	১৮৯৪—৯৫
কাপড়ের কল—	৫৮	৮১	১১৪	১১৪
কলে নিযুক্ত জন—	৩৫,৫৩৭	৬১,৫৯৬	৯৯,২২৪	১৩৯,৫৭৮

[Gadgil—Industrial Revolution in India]

অবশ্য এই কাপড়ের কলগুলিতে লগ্নি পুঁজির পরিমাণ অতি সামান্য ছিল—

মিল	স্থাপিত হ'বার সন	মোট মূলধন
আমেদাবাদ কটন মিলস্ কোং	১৮৬১	৬,৫৪,০০০ টাকা
আমেদাবাদ স্পিনিং এ্যাণ্ড মানু কোং	১৮৭৭	৩,৫০,০০০ ,,
গুজরাট স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল	১৮৭৮	৮,০০,০০০

[Bombay Gazeteer Vol—V]

রপ্তানী বাণিজ্যের দিক দিয়ে দেখি সেদিন ভারতীয় সূতার শতকরা ৯০ ভাগই যেত চীনে, বাকী দশভাগ মালয়, যবদ্বীপ, আফ্রিকায় ও বৃটেনে। একথা স্মরণ রাখি যেন, তৈয়ারী বস্ত্র বৃটেন থেকেই আসত। যাই হোক্—এই কাপড়ের কল থেকে মুনাফা সঞ্চয় করে ভারতের উঠতি বুর্জ্জোয়া শ্রেণী আধুনিক ভারী যন্ত্রপাতির শিল্প গড়ে তুললেন। জামশেদজীর 'টাটা আয়রণ ওয়ার্কস্' তৈয়ারী ভারতের প্রথম ভারী যন্ত্রশিল্পের পত্তন—বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। এই শিল্পের পত্তন সম্পর্কে কেম্ব্রিজের অধ্যাপক হ্যারিস সাহেব তাঁর Life of J. N. Tata পুঁথিতে এক প্রমাণ্য বিবরণ দিয়েছেন।

তখন ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের শৈশবকাল। দেশের শিল্প গড়ে তুলতে হবে—ভারতীয়েরাই গড়বে ভারতীয় শিল্প—বিদেশী পণ্যকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। সেই সময় দোরাবজী টাটা ও পাদশা এই উদ্দেশ্যে মূলধনের আশায় ইংলণ্ডের বাজারে ধর্ণা দিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। দেশে ফিরে এলেন। স্থির করলেন দেশের শিল্পের পত্তন হবে দেশের মানুষের টাকাতেই। অবেদন করলেন মূলধনের জন্য দেশবাসীর কাছে। হ্যারিস্ লিখেছেন—"সকাল থেকে গভীর রাত অবধি টাটাদের বোম্বাই অফিসে সে কি অসম্ভব ভীড়। দেশবাসী মূলধন নিয়োগ করবেন স্বদেশী শিল্পে। দলে দলে এসেছেন, যুবক ও বৃদ্ধ, ধনী এবং গরীব, পুরুষ ও মেয়ে—যার যা সামর্থ্য সম্বল নিয়ে। তিন সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র মূলধন (১৬,৩০,০০০০ পাউণ্ড)

সংগৃহীত হয়ে গেল ৮ হাজার ভারতবাসীদের কাছ থেকে।"[১] কারখানা নির্ম্মিত হল—Messers Tata and sons Ltd নিযুক্ত হলেন ম্যানেজিং এজেন্টস্।

১৯১১ সালে লোহা উৎপাদন সুরু হয়। প্রথম পর্য্যায়ে লাভের পরিমাণ হয়েছিল ৮,৫৪,৫৮৩ টাকা।

অর্থাৎ ১৯ শতকের শেষভাগে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর যে শৈশবকাল সুরু হয়েছিল—বিশ শতকে লৌহ-ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা ও দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে সে তার যৌবনে পদার্পণ করল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমন ও পরবর্ত্তীকালে বিদেশী শাসন ও শোষণ প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতের সেদিনের চল্‌তি অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হয়—একথা আগেই বলেছি। কিন্তু এর ফলে ভারতের দিনমুজর জনের সৃষ্টি হয়। বিধ্বস্ত কুটিরশিল্প কারিগর, জমিতে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট ভূমিহীন কৃষক—এদের নিয়েই এই দিন-মজুরের দলটি সেদিন পুষ্ট হচ্ছিল। এই ধরণের দিন-মজুর শ্রেণী সেদিনের বিদেশী ধনতান্ত্রিক কৃষিকাজের (foreign capitalistic agriculture) পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। ভারতের অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখেছি' এই আলোচ্যকালে অতিদ্রুত ভারতের সেদিন শিল্পসংস্থার পতন ঘটে। বিশেষ করে ১৮৩৩ সালের পরে ভারতে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্ত্তনের পরবর্ত্তীকাল থেকেই বৃটিশ ব্যবসায়ীদের যন্ত্রশিল্পের স্বল্পমূল্যের পণ্যের সাথে প্রতি-যোগিতায় কুটিরশিল্পের পণ্যের পরাজয় ও তার ফলে তাদের ধ্বংস অতিদ্রুত ঘটতে থাকে। এই বিদেশীদের উন্নত যন্ত্রশিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রমিক সেদিন কাজ করত। তারপর ১৮১৪ সালে ইঙ্গভারত বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ নিষিদ্ধ হওয়ায় ভারতের জাহাজ নির্ম্মান কারখানা এবং নৌ-শিল্পের পতনের শুরু হয়। [সেদিন ইংল্যাণ্ডে প্রাচ্য থেকে ভারতীয় নাবিক ও লস্কর

পরিচালিত জাহাজে প্রাচ্য থেকে পণ্য আমদানী নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করা হয়।] ক্রমে লোহা ও চামড়ার কাজেও মন্দা ঘটে যার ফলেও অনেক লোক সেদিন কর্ম্মচ্যুত হয়। আর যেহেতু এর সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক হিসাবে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার কোন কাজ সেদিন করা হয়নি, সেহেতু কর্ম্মচ্যুত লোক গিয়ে ভীড় জমাতে থাকে জমিতে। সেদিন য়ূরোপীয় বাগিচা চাষীরা প্লানট্যাশনের কাজের দৌলতে জমিতে কিছু কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ ঘটে। সিল্ক, নীল, রবার, চা, কফি তূলার চাষ সেদিন শুরু হয়েছিল য়ুরোপীয়দের তত্বাবধানে—একথা ত বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায়। সেদিন কোম্পানীর পক্ষ থেকে কৃষকদের জোর করে ফলচাষের জমিতে পশম ও নীলচাষ করানো হয়। নীলকরদের কথা ত' এত শীগ্‌গির ভুলে যাবার নয়! সেদিন বাষ্প ব্যবহার করা হয়েছিল পশম, নীল কার্পাস ও চা প্রভৃতি কাঁচামালগুলির সংগ্রহের কাজেই—এদেশে বড় কোন কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয়। এইসব কারণে সেদিনের পরস্পর নির্ভরশীল সহর ও গ্রাম-জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 'হয়। জনসাধারণের কি সহরের কি গ্রামের স্বাভাবিক ও পুরাতন জীবিকার উপায় বিধ্বস্ত হয়—ফলে আবির্ভাব ঘটে দিন-মজুরের।

আবার ইতিমধ্যে কোম্পানীর অনুসৃত নূতন ভূমিনীতির সাধারণ চাষীদের দুরবস্থা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকার জমিদার বা তাঁদের কর্মচারীদের অত্যাচারে কৃষক সম্প্রদায় অতিক্রুত নিঃস্ব হতে থাকে। রায়তওয়ারী ব্যবস্থাতেও চাষীদের অবস্থা এর চেয়ে উন্নত হ'ল না। এই ব্যবস্থাতে টাকার মাধ্যমে খাজনা ধার্য্য করা হয়েছিল এবং টাকাতেই ফসলে নয়, খাজনা দেবার ব্যবস্থা থাকার ফলে কৃষকেরা এই এলাকায়, অতি শীগ্‌গিরই মহাজনদের কবলে গিয়ে পড়ল। আর

এই মহাজনরা হ'ল আগের দিনের ধনিকশ্রেণীর উত্তরাধিকারী যারা শেষ বাণিজ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে জমিতে সুদে ঋণ দেওয়ার কারবার শুরু করে। এবং রেজিষ্ট্রেশন আইনের সুযোগে এই মহাজনরা খুব সহজেই কৃষকদের জমি থেকে বঞ্চিত করে। এই শোচনীয় অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হতে লাগল যখন কুটির-শিল্পচ্যুত জন জমিতে গিয়ে ভীড় জমাতে থাকল। অর্থাৎ সেদিন বিদেশী পুঁজিপতিদের সস্তায় শ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্র প্রায় প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। এমন সময় ১৮৪৩ সালে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হ'ল। এর প্রত্যক্ষ ফল হল অসংখ্য বেকার সৃষ্টি—চরম সুবিধা হ'ল পুঁজিপতিদের—তা তারা কৃষিগতই হোক আর শিল্পগতই হোক্। বিদেশী পুঁজিপতিরা এই সুযোগেই এদের মধ্য থেকে বিদেশে আবাদী শ্রমিক সংগ্রহ করে। তাই ১৯ শতকের মধ্যভাগ ও শেষভাগে ভারতীয়দের দেশান্তরী হবার পালা সুরু হল।

বিদেশে ভারতীয় কুলি চালান

সেই ইতিহাস খুবই সংক্ষেপে রচনান্তর থেকে বর্ণনা করি—"অতীত দিনের কথা একরকম বুঝতাম। সেদিনের উপনিবেশ স্থাপনের মূলে ছিল হয় বাণিজ্যিক স্বার্থ নয় সংস্কৃতি প্রচারের প্রেরণা। ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁর Ancient Indian Colonies in the Far East (Vol I Chap J) পুঁথিতে লিখেছেন, Indian emigration is as old as Indian maritime enterprise." আর অন্যান্য ইতিহাসের পুঁথিতেও দেখেছি সেই খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে পূর্ব্বআর্কিপেলেগো এবং সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয়রা বসবাস বা উপনিবেশ স্থাপন করেছে। ব্রহ্মদেশ মালয় থেকে ইন্দোনেশিয়া ইন্দোচীন পর্য্যন্ত

বিভিন্ন জায়গায় ভারতবাসীরা বাণিজ্যিক স্বার্থে তাহাদের উপনিবেশ তাঁবু গেড়েছে—এ সংবাদও আমরা প্রায় খৃষ্টীয় ৫০ শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়াতে বসে লেখা টলেমির (Ptolemy) ভূগোলে পেয়েছি। এই ধরণের উপনিবেশ স্থাপনের মূলে সংস্কৃতি লেন-দেনের প্রেরণা যে ছিল তা'ত অ্যাঙ্কর-ভট্, সুমাত্রা জাভা, বালির সংস্কৃতির ইতিহাস থেকেই জানি। তারপর সুদূর প্রাচ্যে এই ভারতীয় দেশান্তরীরা বিভিন্ন দেশে শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছে এ খবরও পাই। ৪০০ খৃষ্টাব্দে চীনা পর্য্যটক ফাহিয়ান যখন ভারতে এলেন, সেই সময়ই দেখা গেছে চীন দেশের খূটান, তুরফান, কুচা, তুয়ান্ হুয়াং এবং হোনানে দেশান্তরী ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্টি কেন্দ্র। অন্ধ্র ও কৌশল রাজাদের সম্পর্কে শুনেছি যে তারাও দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের কোদ্রমে এই ধরণের উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

পাল সেন রাজাদের আমলে বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত তিব্বত ও ধারে-পাশের অন্যান্য দেশগুলিতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সেইখানেই থেকে গেলেন। বাবিলন, এশিয়া মাইনর, ফোনোসিয়াতে এ ধরণের বসবাস যোগাযোগের কাহিনীও আমরা পড়েছি।

এ গেল অতীত দিনের কাহিনী। আর এত আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা, গৌরবের বিষয়। কিন্তু হাল আমলের কথাটা কি? এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, দারিদ্র্যের জ্বালা, জঠরের ক্ষুধা মেটাবার প্রেরণায় নিজেদের সমৃদ্ধিশালী দেশ ছেড়ে বিদেশ বিভুঁয়ে গেলাম গোলাম হয়ে। এর পাশে অতীত দিনের দেশান্তরী হওয়াটা যেন রাজপুত্রের 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হয়ে রাজকন্যার খোঁজে আপদ বিপদ কষ্ট বরণের সামিল হওয়া। সেদিন গিয়েছিলাম উদ্‌বৃত্ত পণ্যদ্রব্যের বাজার খুঁজতে,

নয় সংস্কৃতি শিল্পের পসারী হয়ে ; আর এদিন গেলাম নিজেরাই পণ্যদ্রব্য হয়ে। হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছে আধুনিক কালে যাঁরা দেশান্তরী হয়েছেন তাঁরা অধিকাংশই শ্রমিক—আজ আর কিছু নাই, তাই শ্রম বেচতে গিয়েছি—প্রাণে বাঁচতে হবে তো! এই গোলাম হয়ে দেশান্তরী হবার কি কারণ এল? প্রধানতঃ চারটি কারণই চোখে ঠেকে। প্রথমতঃ বিদেশে বাগিচা শ্রমিকের চাহিদা; দ্বিতীয়তঃ স্বদেশী শিল্পের পতন; তৃতীয়তঃ ভূমি রাজস্বের বৃদ্ধি ও ফলে কৃষকদের দুর্দ্দশা; চতুর্থতঃ দুর্ভিক্ষ। এর প্রত্যেকটির ক্রিয়া হল দেশের লোকের চোখের জল ফেলে দেশান্তরী হওয়া। ব্যাখ্যা করা যাক্—

প্রথম কারণটাই ধরুন। সেই আঠারো শতকের শেষ দিকে আর উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংলণ্ড আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প বিপ্লবের ধূম পড়েছে। তখন এই শিল্পপতি আর বেনেদের মধ্যে স্নুরু হ'ল মহা রেষারেষি আর কাড়াকাড়ি,—বিশেষ করে প্রাচ্যের পিছিয়ে থাকা দেশগুলির একমাত্র ধন কাঁচা মাল আর সস্তা শ্রমিক পাওয়া নিয়ে। ইউরোপের এ সব বড় বড় কারখানার দেশগুলি মূলধন আর দেশের সীমানার দিক দিয়ে বড় হলে হবে কি, জনবল সেই তুলনায় কম। কাজে কাজেই, জমি এমনি পড়ে থাকে—চাষ হয় না, আর চাষ হয়ত কল চালাবার শ্রমিক পাওয়া যায় না। কি করে তাহ'লে? বসে বসে ভাবে। এইদিকে সেদিনের ওলন্দাজ বেনেদের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা বসে বসে বৈঠক করেন—ইউরোপের শ্রমিক সুবিধা-জনক—না দাস শ্রমিক? ডিরেক্টর বাবুরা অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন দাস শ্রমিক ভাল। সস্তা ত' বটেই আর বোকাও—তাই যত খুসী খাটাও। সব শিয়ালের এক রা। বৃটিশ বেনেরাও তাল ঠুকে বল্লে—ঠিক। কিন্তু এদিকে হয়েছে কি, ১৮৩৩ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সবখানেই দাস প্রথা বন্ধ করে আদেশ

জারী হয়েছে। তাই আবার বেণেদের মুখ শুকিয়ে কালো। শেষে ঠিক হ'ল আফ্রিকা, পলিনেশিয়া, মাল্টা প্রভৃতি অসভ্য দেশগুলির দেশী কালো নিগ্রো শ্রমিকদের লাগাও—ভারী সস্তা আর বড়ই বোকা। বোকা হলই বা! তারা ত' কল চালাবে না সেজন্য নিজের দেশের শ্রমিকই ত রয়েছে। বোকা শ্রমিকদের লাগাও প্ল্যানটেশনের কাজে। কিন্তু ওরা বল্লে আমাদের এমন দায় পড়েনি যে আমাদের বহু দিনের জীবনধারা ছেড়ে বিদেশ বিভুঁয়ে জানমান দিয়ে খেটে অপরের কলের মাল যোগাই। আমাদের দেশে নুন ভাত যা জুটেছে তাই যথেষ্ট। (His limited need could never persuade him to reconcile himself to the hard nature of Plantation labour—Indian Over Seas—Kondapi). শাদা শ্রমিকদেরত' এ কাজে লাগান যাবে না আগেই বলেছি। আরও কারণ আছে। ওরা যে জল হাওয়ায় মানুষ হয়েছে তা এসব কাজের পরিপন্থী। শেষে অনেক ভেবে ঠিক হ'ল, একরার নামা প্রথাই চালু হোক। দক্ষিণ আমেরিকা আর কিউবাতে' ওরা—প্লাণ্টার্স'রা এই প্রথাতেই চীনের শ্রমিকদের পাচ্ছে। তাই বৃটিশ বেনে আর প্লাণ্টার্স'রা তাদের সদ্য জয় করা ভারতের কালো বোকা শ্রমিকদের একরার প্রথায় বেঁধে দিতে লাগল চালান—আফ্রিকা, মালয়, ব্রহ্ম প্রভৃতি জায়গায় সেখানে তাদের বাগিচার কাজ হয়েছে শুরু। কিন্তু এতে ত দেখি আমাদের দেশান্তরী হবার পালা হ'ল শুরু। কথা উঠবে —কি দুঃখে এই একরার প্রথায় নাম লিখিয়ে বাপ পিতামহের ভিটে ছেড়ে দেশান্তরী হলুম। ঐ যে, আগেই বলেছি পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। এখন কথা হল হঠাৎ এ পেটের জ্বালাটা এলো কোথা থেকে। বাকী তিনটে কারণের ব্যাখ্যা করলেই এর উত্তর পাবেন।

সেই 'সাত সমুদ্রর তের নদী' পারে বিলেতে হল শিল্পবিপ্লব, বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠল ওদের দেশে, ওরা ভাল খাবে ভাল পরবে বলে। ঐ দেশের বেনিয়া ত আগেই এসেছে এদেশে, ক্রমশঃ দখল করল এদেশের শাসন শোষণের যন্ত্র। তাই যেখানে মালিকের দেশে কল চলেছে, ভাল ভাল জিনিস তৈরী হচ্ছে সেখানে কি প্রজাদের দেশের হাতের কল চালিয়ে আরও ভাল ভাল জিনিস তৈরী করে বিদেশের বাজারে পাঠিয়ে মালিকের দেশের কল আর কলওয়ালাকে ঠকান ভাল ঠেকে? না মালিকই সেটা সইবে? কাজেকাজেই মালিকের দেশের কল কারখানা আর কারবারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রজাদের দেশের কল চালানো বিদেশে মাল পাঠানো বন্ধ হ'ল। তারা কেবল তাদের সনাতন কাজ চাষ বাস নিয়ে থাকবে আর মালিকের দেশের কল কারখানার জন্য কাঁচা মাল পাঠাবে।

এর পূর্ব্বে প্রজাদের দেশের চেহারাটা কেমন ছিল? তবে শুনুন ১৭-১৮ শতকের এশিয়া আর ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে ভারতেরই তৈরী মাল হাজারে কাটাত! এ আমার বড়াই করা মুখের কথা নয় ট্যাভারনিয়ের, বেইনস, স্যার জর্জ্জ বার্ডউড, স্যার থমাস মুন্‌রো প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত, লেখক, পর্য্যটক শাসকরাই সেদিনের ভারতবর্ষের শিল্প, কারুশিল্প ও অন্যান্য হাতের কাজের বহর, ব্যাপকতা আর সৌন্দর্য্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। আর তা তাঁরা লিখেও গেছেন বিভিন্ন পুঁথিতে।

বিলেতের বাজার ভরিয়ে দেওয়া হ'ল আমাদের এই পণ্যদ্রব্যে। ১৭৬৪ আর ১৭৬৬ সালে পর পর পার্লামেন্টে নালিশ জানান হ'ল এই ভাবে ভারতের মাল দেশে আমদানী করলে তাদের দেশের উঠতি শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য্য। তাদের সরকারও সাথে সাথেই সাড়া দিল। ভারতের ক্যালিকো সিল্ক আর তূলার দ্রব্যের উপর বসানো হ'ল কড়া হারে শুল্ক। এ সত্ত্বেও সে দেশে লুকিয়ে ছাপিয়ে

মাল পাচার হতে থাকল। শেষে ভারতীয় মসলিন আর ক্যালিকোর বে-আইনি আমদানী বন্ধ করে আইন জারী হ'ল ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে। এতে যখন হ'ল না তখন আমদানী তো পুরোপুরি বন্ধ হলোই, ভারতীয় বস্ত্র কেনাও বন্ধ করে আইন জারী হ'ল। এর ফলটা হ'ল কি? পণ্ডিতদের মুখেই তবে শুনুন। বিলাতী এই নীতির উদ্দেশ্য আর ফল হ'ল to change the whole face of that indurstial country in oder to render it a field of the produce of crude materials subservient to the manufacturers of Great Britain. (রমেশ দত্তের পুঁথি Economic History of India under early British rule—Fifth Edition)। এই উক্তির সমর্থন পাবেন মোহিনী চৌধুরীর Evolution of Indian Industries 1939,এবং Memorandum submitted by Henry Tucker in 1829 to the court of Directors বইয়ে ৯৪ পৃষ্ঠায়। আবার প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর Fiscal Policy of India (পুথির ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ইংরেজ শিল্পপতিরা "employed the arm of pòlitical injustice to keep down and ultimately strangle competitor with whom he could not have contended on equal terms". তা হলে দাঁড়াল এই, রাজার দেশের স্বার্থে নিজের দেশের স্বার্থকে বলি দিয়ে হাজার হাজার লোক বেকার হ'ল আর এরা জমিতে গিয়ে ভীড় জমাল। ফলে জমির ফসল হ্রাস, অন্নকষ্ট, অনটন দুর্দ্দিন হল সুরু।

আবার ধরুন তৃতীয় কারণ। জমির খাজনা বৃদ্ধির ফলে চাষীদের অশেষ দুর্দ্দশা। বাংলাদেশে এবং উত্তর ভারতে ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮২২ সালের মধ্যে জমির আয়ের যথাক্রমে শতকরা ৯০ ভাগ এবং শতকরা ৮০ ভাগ জমির কর ধার্য্য করা হয়। মাদ্রাজে প্রথম যখন ভূমিকর চাপানো হল তার হার হল মোট উৎপাদনের

শতকরা ৭০ ভাগ। এ ধরনের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে কাগজে কুলোয় না। এ সব দেখে শুনে খুব দুঃখ করে Briggs সাহেব ১৮৩০ সালে লিখেছিলেন—"A land tax like that which now exists in India professing to absorb the whole of the landlords rent was never known under any Govt. in Europe and Asia"

রাজার দেশের আবদারে আমাদের শিল্প গেল কৃষিও গেল। রইল শুধু না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরা।

এই শেষের দুইটি কারণের ব্যাখ্যা সহজেই চতুর্থ কারণকে সুস্পষ্ট করে তোলে। অর্থাৎ যখন আমাদের সমৃদ্ধির আর বেঁচে থাকার দুই পথই বন্ধ হ'ল, তখন হামেশাই দুর্ভিক্ষের আনাগোনা হ'ল শুরু। অনাহারে মৃত্যুই আমাদের আহারের সমস্যা কমাতে লাগল। বাংলায় আর উত্তর ভারতে ১৭৭০, ১৭৮৫, ১৮০৪, ১৮৩৭এবং ১৮৬১ আর ১৮৭৭, ১৮৮৯, ১৮৯২ ও ১৮৯৭—১৯০০ সালে দুর্ভিক্ষ হানা দিয়ে বহু লোকের অন্ন সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে গেল। সেই সময়ের দেশের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে রাজার দেশের লোক কর্ণওয়ালিশ লিখেছেন* "One third of the Company's territory Hindustan is now a jungle inhabitated only by beasts."

এই ভাবে দেশের আহার যোগাবার পথগুলি মেরে দেশান্তরী হবার পথ পাকা হ'ল। এবার এল বিলিতী Plantersরা বিদেশে বেশী বেশী বেতনের ভাল ভাল খাবারের বড় বড় ছিপ হাতে নিয়ে। দেশের রাজারাও এদের জাতভাই। যাতে করে এই প্রলোভনে ছিপ ফেলতেই একেবারে মাছে টোপ গেলে, আর জলেও যাতে কোন গণ্ডগোল না হয় তার বন্দোবস্ত করতে কসুর করলেন না। ছিপ ফেলার সাথে সাথে তাই মাছে টপাটপ টোপ গেলে। কি আর করে, বহু দিনের অনাহারী যা পায় তাই খায়।

"The Colonial Govt. appointed professional recruiters who visited India villages stricken with failure of crops or Pilgrim centres, during the huge religious congregation and entrapped poor Indians by dangling before them hopeful picture of prosparity in the colonies" ইতি দেশান্তরী যাত্রা পর্ব্ব। (লেখকের 'দেশান্তরীদের কথা' ধারাবাহিক প্রবন্ধ অভিযাত্রী [আসাম] পৃঃ ২ ৮)।

সমসাময়িক সমাজ মানস

রেলপথ, বৃহদায়তন শিল্প, বাগিচাশিল্প, বাণিজ্যগত কৃষিপণ্য উৎপাদনের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে ভারতে সৃষ্ট ধনতান্ত্রিক পরিবেশ এবং ইংরেজদের বহন করে আনা নতুন জীবনাদর্শ-প্রভাবিত উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতীয় সমাজ মানসে জাতীয়তা-বোধ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ভাবধারার বিকাশের পথ তৈরী করে দেয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের এই ধারাই ইতিহাস নির্দেশিত এবং ইতিহাস প্রমাণিত।

ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় রাজদণ্ড বিদেশীদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে অর্থাৎ ভারতের অর্থনীতিতে ইংরেজ অর্থনীতির প্রাধান্য স্থাপন করার এবং নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হ'তে থাকে, ফলে দেশীয় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মনে বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকে। এই বিক্ষোভই রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধে রূপ নেয়। অন্যান্য দেশেও ধনতন্ত্রগত অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে জাতীয়তাবোধের ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ভাবধারার উন্মেষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নজির আছে ইতিহাসে। ঐ সব দেশে দেখা গিয়েছে, ধনতন্ত্রগত অর্থনীতি; জাতীয়তাবোধ এবং গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্রীয় ভাবধারার সাথে প্রথমেই তাই দেখা যায় সেদিনের প্রচলিত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিগত ভাবধারা-বিধিব্যবস্থার প্রবল সংঘর্ষ। নতুন শক্তির কাছে পুরাতনকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। তাছাড়া দুর্বল সামন্ততন্ত্রগত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাতে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পাশ্রিত ধনতন্ত্রগত অর্থনীতির বিকাশ অসম্ভব। দৃঢ় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, গণ্ডীবদ্ধ ধর্ম্মীয়-কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনচর্চ্চা ও চর্য্যার পরিবর্ত্তে উদার, যুক্তি-ভিত্তিক, আত্মবিশ্বাস ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা-সম্পন্ন জীবনচর্চ্চা ও চর্য্যা—ধনতন্ত্রগত অর্থনীতিক বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য্য পরিবেশ। তাই যন্ত্রশিল্প আশ্রিত ধনতন্ত্রগত অর্থনীতির বিকাশের সাথে সাথে এই অর্থনীতির প্রতিভূ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে দুর্ব্বল ফুরিয়ে আসা সামন্ততন্ত্রের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে এবং এই সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই ধনতন্ত্রআশ্রিত গণতান্ত্রিক এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত জীবনবাদের পরিবর্ত্তে জাতীয়তা-বাদী রাষ্ট্রীয় ভাবধারা সৃষ্ট নতুন সমাজ জীবনের শুভ উদ্বোধন ঘটে।

আমাদের দেশের কথা অবশ্য কিছুটা স্বতন্ত্র। আগেই বলেছি ইংরেজ আগমণের পূর্ব্বেই আমাদের দেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশের উপাদান সুলভ ও পরিবেশ অনুকূল হ'য়ে উঠছিল। কিন্তু য়ূরোপের যন্ত্রশিল্পাশ্রিত নতুন অর্থনীতি ধনতন্ত্রের প্রথম ও শক্তিশালী প্রতিভূ ইংরেজের এদেশে অভিযানে সব আয়োজন আমাদের ব্যর্থ হ'য়ে যায়। অবশ্য অবশেষে এই বিদেশীদের স্বার্থে এদেশে ইংরেজ যে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে তার ফলে সেদিনের স্তব্ধ সমাজ-মানস নূতন ক'রে বিকাশের পথ খুঁজে পেল—রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ ছিলেন পথিকৃৎ।

* * * *

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সেদিন আমাদের দেশের উঠতি বিত্তবান মধ্যবিত্ত ও শিল্পপতিরা দেশে নির্ব্বাধ

শিল্পায়নের কাজে পাহাড় প্রমাণ বাধা উপলব্ধি করেন। উচ্চ-শিক্ষিত ভারতীয়েরা দেখলেন, রাজ্যশাসনের সকল উচ্চপদ বিদেশী করায়ত্ত করার সরকার অনুসৃত নীতির ফলে তাঁদের ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ। ইংরেজদের প্রবর্ত্তিত নূতন ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার মধ্যে মাটির মানুষ কৃষকেরা দেখল, তাদের তিলে তিলে ধ্বংস করবার জাল বিস্তৃত অর্থাৎ সেদিন সকল শ্রেণীর মানুষ দেখেছিল, বৈষয়িক ও মানসিক বিকাশ ইংরেজ শাসনের বিদেশী শাসনের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ। তারা একথাও উপলব্ধি করেছিল, গণ্ডির অবসান ঘটানই মুক্তির একমাত্র পথ। সেদিনের সমাজ মানসের পুরোধায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা বুঝেছিলেন, সামন্ত যুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন উদ্যমহীন সমাজ মানসকে নতুন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করাই প্রাথমিক কাজ। তাই যদিও জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় বোধের আবির্ভাব ঘটেছে ১৯ শতকের শেষ ভাগে কিন্তু তার বীজ উপ্ত হয়েছে ঐ শতকের প্রথমার্দ্ধেই। ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্যে সেদিনের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তার ফলে য়ুরোপের মানবধর্ম্ম গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের জাতীয় চেতনায় ধর্ম্মগত প্রকাশ উপলব্ধি করা যায়। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে—১৮৪৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি এবং ১৮৫১ সালে কয়েকটি ছোট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন।

এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সেদিনের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও এই আন্দোলন সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের আন্দোলন হ'য়ে উঠতে পারেনি। কেননা সেদিন অবধি সর্ব্বভারতীয় যোগাযোগ যানবাহন ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নি বা ইতিহাসগত পরিবেশও তখন গড়ে ওঠেনি।

প্রসঙ্গে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কথা উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ শাসনের বিধি-ব্যবস্থায় পুরাতন সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছু প্রকাশ বিদ্রোহের মধ্যে ফুটে উঠছিল—নেতৃত্ব যে ভূস্বামীদের হাতে ছিল এবং তাদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছিল তা' অস্বীকার করা যায় না। ডাঃ ডাফ লিখেছিলেন, why, if it had been merely a military mutiny, in the midst of an unsympathetic, unaiding population, a few decisive victories, such as we had, might quash it……And it is a fact that it is not a mere military revolt but a rebellion—a revolution…

From the very outset, it has been gradually assuming more and more the character of a rebellion —a rebellion on the part of vast multitudes beyond the sepoy army against British Supremacy and Sovereignty.

ইংরেজদের বিশেষ করে লর্ড ডালহৌসির সম্প্রসারণ নীতির ফলে বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় সামন্ত রাজ্যের বিলোপ, ইংরেজদের প্রবর্ত্তিত নূতন ভূমিব্যবস্থার ফলে কৃষকদের জীবনে অসহনীয় দারিদ্র্যের সৃষ্টি এবং সরকারের অনুসৃত নীতি ও বৃহৎ যন্ত্রশিল্পোৎপাদিত পণ্যের দেশীয় বাজার দখলের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কর্ম্মীকারিগরদের সর্ব্বনাশ সাধনের ফলে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তা' ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত কারণ। উল্লেখযোগ্য সেদিনের, উঠতি মধ্যবিত্ত, ধনিক-বণিক সম্প্রদায় এবং ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিদ্রোহের ব্যাপারে দেখা গেল সম্পূর্ণ নীরব। অবশ্য কেউ কেউ নিন্দাও করেছেন এমন নিদর্শনও আছে। ভূমিচ্যুত সামন্তভূস্বামীরা তাদের হৃত সম্পদের পুনরুদ্ধারের এবং ইংরেজ শাসনের সামন্ত

যুগীয় বিধি ব্যবস্থার বিরোধী নীতির অবসানের আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহে নেতৃত্বের অংশ গ্রহণ করেন।

তাছাড়া, বিদেশী পরিচালিত বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যেও বিদেশী মালিকদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া ইংরেজ শাসন বিরোধী বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। খৃষ্টান মিশনারীদের কার্য্যকলাপ এবং ইংরেজ প্রবর্তিত ধর্ম নিরপেক্ষ আইন, সতীদাহ প্রথা নিবারণ ব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে দেশী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মৌলভী ও ধর্ম্মান্ধ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত সহরে টেলিগ্রাফ প্রমুখ উন্নয়ন মূলক কাজকেও সেদিনের রক্ষণশীল সমাজ ভাল চোখে দেখেনি। অর্থাৎ সেদিনের বিদ্রোহ, মোটামুটিভাবে বলা চলে, নূতন অর্থনীতি ও সমাজমানসের আবির্ভাবে আতঙ্কিত রক্ষণশীল সমাজের আত্মরক্ষার বিদ্রোহ হিসাবে সুরু হয় এবং নেতৃত্বে সেদিন রক্ষণশীল সমাজই ছিলেন। তবে ইংরেজ শাসনশোষণ-আহত সাধারণ মানুষের বিক্ষোভও বিদ্রোহে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

অর্থাৎ বিদ্রোহের পিছনে শ্রেণীস্বার্থগত ঐক্য ছিল না। একদিকে ছিল অত্যাচার, দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অপর দিকে ছিল ভূস্বামীদের সামন্তশ্রেণীগত স্বার্থ। ফলে স্বার্থক নেতৃত্ব ছিল না বা বিদ্রোহের সাংগঠনিক ঐক্য ছিল না। সেইজন্য বিদ্রোহ সার্ব্বিক রূপ নিতে পারে নি। British Imperealism in Indiaতে Joan Beonchamp লিখেছিলেন, The lack of unity among forces against the British was a factor of which they took advantage. The native cheifs soon realised that if they joined too closely with the peasants and artisans the control of the movement would gradually slip out of their hands. (P—35)

অর্থাৎ এই বিদ্রোহকে আমরা জাতীয় অভ্যুত্থান আখ্যা দিতে পারি না—এই বিদ্রোহ নিতান্তই বিদেশী বিরোধী ছিল। অবশ্য

এবিষয় আমাদের আলোচ্য নয়। তবে এই বিদ্রোহ পরবর্ত্তী কালের জাতীয়তা বোধের উন্মেষ ও সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি জুগিয়েছে।

রেলপথ ও উন্নত ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতের ইতিহাসে প্রথম সর্ব্বভারতীয়ভাবে একরাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিগত ক্রিয়া সুরু হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এক জাতি হিসাবে ঐক্যবোধের পরিবেশ সৃষ্টি হ'ল। এই ঐক্যবোধকে রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে হলে সংস্কৃতিগত এবং অর্থনীতিগত পুনর্গঠন অপরিহার্য্য। প্রাচীন জীবনাদর্শ, ধ্যানধারণা, সামাজিক রীতিনীতির (যেমন জাতিভেদ প্রথা, ধর্ম্মান্ধতা, নিরক্ষরতা প্রভৃতি) প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবের হাত থেকে সমাজমানসকে মুক্ত করতে না পারলে ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে নূতন জীবনাদর্শ, জীবনচর্চ্চা ও চর্য্যার আবির্ভাব ঘটল—সামাজিক জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—একথা সেদিন ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে, প্রাচীনের সাথে নবীনের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। এই সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই সমাজ মানসে ধর্ম্মগত ও সমাজগত সংস্কার এবং শেষে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে।

ধর্ম্মীয় সংস্কারের কাজে গণতান্ত্রিক ভাবধারার আন্দোলন সুরু করেন রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র, তেলাঙ্গ ও ফুলে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য্য সমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতির মাধ্যমে। নানারকম ধর্ম্মীয় প্রথাপার্বণ, কুসংস্কার যন্ত্রশিল্প-গত অর্থনীতির পক্ষে অন্যতম বাধা এ উপলব্ধি সেদিনের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মানুষের ঘটেছিল।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইংরেজদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভারতে ধনতন্ত্রগত অর্থনীতির উদ্বোধন ঘটে। ধনতন্ত্রগত অর্থ-

নীতির বিকাশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, অবাধ প্রতিযোগিতা, চুক্তি করবার ও সম্পত্তির উপর ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতি অন্যতম সর্ত্ত। বংশগত, জাতিভেদ প্রথা এবং স্ত্রীপুরুষ ভেদের উপর প্রাক্ ধনতান্ত্রিক যুগের স্বৈরাচারী ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিপরীত ধনতান্ত্রিক যুগের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের এবং বংশ ও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার বোধের জীবনাদর্শ। কাজেই এই নূতন জীবনাদর্শ সামাজিক অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে জাতিবংশ-স্ত্রীপুরুষভেদ-নির্ভর সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগের প্রথার অবসানই সামাজিক অগ্রগতিতে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সেদিনের শিক্ষিত সমাজ-মানসে স্বীকৃতি পেল।

বাস্তবিক ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য্য সমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, প্রভৃতি * ধর্ম্মসংস্কারমূলক আন্দোলন নূতন সমাজের প্রয়োজনে ধর্ম্ম সংস্কারের কাজে হাত দেন। এই আন্দোলনগুলি এমন একটি ধর্ম্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যাতে ভারতের হিন্দু মুসলমান পার্শী এবং অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। সেদিন ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, স্ত্রীপুরুষ ভেদাভেদ, জাতিভেদ প্রথা এবং ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র ক্ষমতার বিলোপ করার ধর্ম্ম সংস্কারই একমাত্র পথ ছিল।

ভারতে দীন হ'লেও বৃহৎ যন্ত্রশিল্পগত অর্থনীতিক ক্রিয়াকর্ম্মের প্রারম্ভকাল হিসাবে ১৯ শতকের ৬ দশককে চিহ্নিত করা যেতে পারে। লক্ষ্য করবার বিষয় ঐ শতকের ৭ দশকের পূর্ব্বে ভারতের সমাজমানসে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সুসংগঠিত অবস্থায় আমরা দেখতে পাইনে। একথা সত্য, উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণীসুলভ গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ভাবধারার আবির্ভাব ১৯ শতকের ৩ দশক থেকেই অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের সাথে সাথেই ঘটে।

১৮৭০এর পর থেকে দেশে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ উপলব্ধি করা গেল এবং তা' ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস্ প্রতিষ্ঠায় রূপ নেয়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, সামন্তদের নেতৃত্বে দুঃস্থ নিঃস্ব মানুষদের ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহ হ'লেও—নেতৃত্বের জন্যে উদ্দেশ্য প্রগাতশীল ছিল না। ১৮৫৭ সালের পর ১৮৬০ সালের মধ্যে আরও দুটি বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়—একটি ওয়াহঁবী আন্দোলন এবং অপরটি মারাঠা আন্দোলন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের মতই এই বিদ্রোহ দুটি বৃটিশ বিরোধী হলেও সম্প্রদায় ভিত্তিক ছিল—সর্ব্বভারতীয় আন্দোলন ছিল না এবং নেতৃত্বও ছিল সামন্তদের হাতে।

কিন্তু ১৮৬০এর পরে যে সব বিক্ষোভ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তাদের প্রকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। একদিকে নূতন ভূমি ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের ঘাড়ে ক্রমবর্দ্ধমান রাজস্বের বোঝা চাপতে থাকে ও দারিদ্র্য তীব্রতর হতে থাকে এবং অপর দিকে সরকার-অনুসৃতনীতির দরুণ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পতন ঘটায় অসংখ্য কারিগর বৃত্তিচ্যুত হয় এবং কৃষিতে গিয়ে ভিড় জমায়, ফলে কৃষি অর্থনীতিতে সংকট আরও তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। এর পর এল ১৮৭০এর কৃষিমন্দা এবং ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সাল অবধি ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের হানায় সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠে; ফলে বিক্ষোভ ক্রমশঃই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৭৬।৭৭এর দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে, দুই লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী জায়গা এবং ৩৬০ লক্ষ মানুষ এই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। এই সংকট এমন কালে ঘটে যখন ভারতের কৃষিব্যবস্থায় টাকায় খাজনার দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে, ফলে সেদিনে রায়তরা মহাজনদের দুয়ারে ঋণের জন্য ধর্ণা দিতে বাধ্য হ'ল এবং দুর্ভিক্ষের পর দেখা দিল মন্দা তখন রায়তদের দাসত্ব পাকা হ'ল।

কৃষককারিগরদের অর্থনীতিক ক্রমঅবনতি, ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ এবং শেষে জমিদারমহাজনদের দাসে পরিণত হওয়ার প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল কৃষকদের মধ্যে। ১৮৭৫ সালে দাক্ষিণাত্যে কৃষকদের ধূমায়িত অসন্তোষ বিদ্রোহে রূপ নিল। ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহ সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত হ'য়ে রয়েছে।

সেদিনের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের মনে উপরে বর্ণিত কারণে যে বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হ'তে থাকে তাকে আরও তীব্র করে তোলে আরও কয়েকটি ঘটনা। দেশে যখন তীব্র খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষ, অনাহার মৃত্যুর অবস্থা বিরাজ করছে তখন সরকার থেকে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের খরচ চাপান হ'ল সাধারণ মানুষের ঘাড়ে এবং নানা আড়ম্বরে, বিপুল অর্থব্যয় প্রভৃত জাঁকজমক সহকারে দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠিত হ'ল। অপরদিকে, ১৮৭৮ সালে Vernacular Press Act প্রবর্ত্তন করে দেশী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের ব্যবস্থা করা হ'ল। উদ্দেশ্য ছিল, সেদিনের সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ যেন সংঘটিত হয়ে উঠতে না পারে। ল্যাঙ্কাসায়ার বস্ত্র-শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতের বস্ত্রশিল্পের প্রভূত ক্ষতি করে যেদিন বিলেত থেকে আমদানী করা কার্পাস পণ্যের উপর শুল্ক একেবারে তুলে দেওয়া হ'ল সেদিন ভারতীয় শিল্পপতি, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিতদের মধ্যেও বিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে। এদিকে ইংরেজ শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও প্রসারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যেমন, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইটালির স্বাধীনতার যুদ্ধ প্রভৃতি এবং থমাস পেইন, স্পেনসার, বার্ক, মিল, ভলটেয়ার, ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডির গণতন্ত্র, স্বাধীনতা সম্পর্কে রচনা প্রবল আলোড়ন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সেদিন জাতীয়বাদী ভাবধারা ও আন্দোলন সংঘটিত হতে

থাকে। এঁরা চেয়েছিলেন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে একটি ভারতীয় জাতীয়তার সৃষ্টি করতে এবং এইখানেই এই আন্দোলনের সাথে ১৮৫৭এর বিদ্রোহের উদ্দেশ্যের পার্থক্য। ১৮৫৭এর বিদ্রোহ চেয়েছিল, পূর্ব্বতন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনপ্রবর্ত্তন। কিন্তু ইতিহাস ঐ পর্য্যায় যে অতিক্রম করে এসেছে, সে দূরদৃষ্টি ১৮৫৭এর বিদ্রোহের নেতাদের ছিল না, কেন না তাদের ত নূতন জীবনাদর্শের সাথে তখনও পরিচয় ঘটে নি।

১৮৭০ সাল থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্র ও সাহিত্যের প্রসার ঘটতে থাকে। এই সংবাদপত্র ও সাহিত্য সেদিনের বিক্ষোভকে সংগঠিত করে এবং সাধারণ মানুষের মনে জাতীয়তাবোধের আকাঙ্খার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করে। Hans Kohn লিখেছিলেন, "The Press, the theatre, and the secret revolutionary Societies were especially active in Bengal in forwarding nationalist army—the lives of Garivaldi and Mazinni were translated, while the goal of national liberation was proclaimed in such works, as the history of India gained in a dream." দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' প্রকাশিত হল নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা ক'রে। সমাজের সকলস্তরে শিল্পপতি মহল থেকে সুরু ক'রে উচ্চবিত্ত শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত কৃষক ও খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রবল ইংরেজী বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে। প্রতিষ্ঠিত হ'ল জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

অর্থাৎ সেদিনের অর্থনীতিক বিবর্ত্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের পরিবেশ তৈরী হ'ল জাতীয়তাবাদী চেতনা ও

আন্দোলনের আবির্ভাবে এবং সেই আন্দোলনকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য সর্ব্বজাতীয় রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায়।

* * * *

সেদিনের সমাজ মানসের বিবর্ত্তন প্রসঙ্গে দুইটি অন্যতম ব্যক্তিত্বের আলোচনা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না…একজন হলেন ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় এবং অপরজন হলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমাদের আলোচ্য কাল ও বিষয় মনে হয়, এই দুই ব্যক্তিত্বের মানসে সর্ব্বাধিক পরিস্ফুট হয়েছে। ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের সাথে অপরিহার্য্যভাবে জড়িত ধর্ম্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের প্রতিভূ রাজা ও বিদ্যাসাগর!

ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস, ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস—কি মানস জীবনে কি জাগতিক-জীবনে। সৃষ্টির বেদনায় এবং অপরদিকে আনন্দেও অস্থির গোটা শতাব্দী। বিগতদিনের সামন্ত যুগীয় জীবন-চর্যা ও চর্চায় ভাঙ্গন ধরেছে এদেশে ইংরাজ আগমনে; বৈদেশিক জীবনাদর্শ ও ভাবধারার আঘাতে প্রাচীন জীবনায়ন, সামাজিক বিন্যাস, জীবনবোধ ও ধ্যানধারণা বিধ্বস্তপ্রায় আর তারই অন্তর ভেদ করে নতুন জীবনবোধ ও জীবনাদর্শে'র আবির্ভাব ঘটছে। এই পুরাতনের বিদায় ও নতুনের আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণ স্বভাবতই অস্থির। সেদিন একদিকে মানব ও মানস মুক্তির প্রবল আকূতি অপর দিকে অতীতের সংস্কারাবদ্ধ জীবনায়ন ও বেদে আছে মনোভাবের পেছনটানের দ্বন্দ্বে বাংলার মানস জীবন আলোড়িত। প্রাচীনকে ভেঙ্গে নবীনের যে আবির্ভাব তা স্বভাবতই বেদনা ও আলোড়নে অস্থির।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজ মানসে আত্মোপলব্ধি, জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের আবির্ভাব উপলব্ধি

করা গেল। মানব ও মানস-মুক্তির প্রবল কামনায় মানবতা-বোধের প্রবল উন্মাদনায় সেদিনের সমাজ-মানস চঞ্চল। এই উন্মাদনা মানস-জীবনে প্রধানভাবে ধর্মসংস্কারের আন্দোলনের পথেই প্রকাশ পেল সেজন্য এই ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনের মধ্যেই সেদিনের ভারতীয় রাষ্ট্রীয়মানসের আবির্ভাব ঘটে। ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে রাষ্ট্রীয় মানসের প্রথম আবির্ভাব ঘটে তা কেবল ভারতের বেলাতেই সত্য নয়—য়ুরোপের ইতিহাসও এর সাক্ষ্য বহন করছে। য়ুরোপেও একই ধরণের আন্দোলন ঘটেছিল। সেখানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে জাতীয়বাদ প্রটেষ্টাণ্টবাদ ও রিফর্ম্মেশনের আন্দোলন রূপে প্রকাশ পায়। কারণ নূতন সমাজ মানস মধ্যযুগীয় ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'তে পারে না। মধ্যযুগীয় ধর্ম্ম আশ্রিত সামন্ত তান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেদিনের উঠতি ধনতন্ত্র প্রসূত জাতীয়-গণ্ডী প্রসারিত বিনিময় ব্যবস্থার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক ছিল। তাছাড়া রোমান চার্চ্চ, কর্ত্তৃক সামন্ত যুগীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমর্থিত ও সংরক্ষিত হওয়ায় উঠতি ধনতন্ত্রগত অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য্য জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয়েছিল। ভারত-বর্ষের ক্ষেত্রেও ইংরেজ আগমনে মানসিক ও জাগতিক জীবনে যে নতুন জীবন চর্যা ও চর্চার আবির্ভাবের সূচনা হলো—তাতে এমনটি ঘটাই স্বাভাবিক। তাই ভারতবর্ষেও প্রথম রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৬ শতকে য়ুরোপে যেমন ঘটেছিল তেমনি ১৯ শতকে বহুধারা সম্বলিত হিন্দুধর্ম্মও এক যুগান্তকারী আধ্যাত্মিক বিপ্লবের দ্বারা সচকিত ও উদ্বোধিত হয়েছিল। রিফর্ম্মেশন আন্দোলনের মত ভারতেও সংস্কার আন্দোলন প্রাচীন ঐতিহ্যানুরাগী রূপ নেয় এবং পরবর্ত্তীকালের অধঃপতন ও কুসংস্কারের নিন্দাও বিরোধিতা করে।

এই ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনগুলি ভাবাদর্শের দিক দিয়ে মূলতঃই জাতীয় আন্দোলন। যদিও রূপগতভাবে (in form) ধর্মীয় আন্দোলন।

ইংরেজ-বিজয় ও ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সেদিন ভারতের মাটিতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্বোধনের কাজ হয়তো বা শাসকদের অজ্ঞাতসারে অথবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুরু হয়। আর তাই ভারতের সমাজ মানসেও ধনতন্ত্রের দর্শন 'লিবারেলিজমের' আবির্ভাব ঘটে। এই লিবারেলিজম সেদিন প্রধাণতঃ জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়েছিল এবং লিবারেলিজমের এই দুই নীতিকে সেদিনের প্রচলিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রসারিত করার প্রচেষ্টায় ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে।

সেদিনের ধর্ম্ম সংস্কার আন্দোলন এমন একটি ধর্মীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যা হিন্দু মুসলমান পার্শী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে একই জাতীয় ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। আধুনিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উন্নয়ন, সকল মানুষের স্বাধীন সত্ত্বা বিকাশের সাহায্য করা, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতিভেদ প্রথা এবং ব্রাহ্মণ শাস্ত্র গুরুর নির্মম প্রতিবাদহীন প্রভুত্ব প্রভৃতির অবসান ঘটান এই ছিল সেদিনের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। একথা বলা প্রয়োজন, য়ুরোপের প্রটেষ্টান্ট আন্দোলন এবং ধর্মীয় রেনেসাঁর নেতাদের মতই ভারতেও ধর্ম সংস্কারকরা অতীতকে পুনর্বাসনের জন্য ধর্মসংস্কার আন্দোলন করেননি ;—তাঁরা নতুন জীবন যাত্রাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার আন্দোলনই করেছিলেন।

এই ধরণের যুগ-সন্ধিক্ষণে যে মানস-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কডওয়েল যে কথা লিখেছিলেন আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে সে কথা উল্লেখযোগ্য। কডওয়েল লিখেছেন,

"Man himself is composed like society of current active being and inherited conscious formulation··· Thus he feels right in the heart of him this tension between being and thinking, between new being and old thought······the incomplete future is dragging at him but because instinctive components of the psyche are the oldest, he often feels this to be the past dragging at him. That is why we come upon the paradox that the hero appeals to the past and urges man to bring out into being again and in doing so produces the future. The return to the classics dominated the bourgeous Renaissance. Rome influeneed Naepoleon and the Revolution. The return to the natural uncorrupted man was the ideal of the eighteenth century revolutionists. Yet it is the new whose tension men fell in their minds and hearts at such times.

He may think, it is the past he is born to save or to establish on earth and only when it is done, it is seen that the future has come into being. The reformer returing to premitive christianity brings bourgeois protestantism into being······"

কডওয়েলের এই উক্তি সেদিনের ভারতীয় ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও ধর্ম-সংস্কারকদের (রামমোহন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ) সম্পর্কেও খুবই প্রযোজ্য।

যাই হোক, একথা বলেছি, সেদিনের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ভারতীয় সমাজ মানসের প্রগতিশীল ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল।

ভারতের জাতীয় চেতনায় প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল এই ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে কেবলমাত্র ধর্মীয়-সংস্কার মূলক কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ ছিলনা—এই আন্দোলনের পরিধি সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্র অবধি বিস্তৃত ছিল। এর কারণ ভারতে সমাজ কাঠামো এবং ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধর্মের প্রশ্রয় ছিল বলেই জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, অযৌক্তিক সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, স্ত্রী-পুরুষে অধিকারভেদ প্রভৃতি সমাজ কাঠামোতে স্বীকৃত ছিল। কাজেই সমাজ সংস্কার আন্দোলন সেদিনের সকল ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই স্বীকৃতি ও বিস্তার লাভ করেছিল। ধর্মকে যুক্তির উপর প্রতিষ্টা (Rationalise) করতে গিয়ে স্বভাবতই সেদিন ধর্ম সংস্কার আন্দোলনকে সমাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সামাজিক সম্পর্কেও সেইমত র‍্যাশনালাইজ করার কর্ম তালিকাও গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেদিনের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের কর্মতালিকায় তাই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার মূলক কর্মপদ্ধতিও গ্রহণ না করে উপায় ছিল না নতুবা ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলনই যে ব্যর্থ হয়। ধর্ম-সংস্কারকদের একদিকে যেমন মূর্তি পূজা ও বহু দেবদেবী পূজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছিল, তেমনিই আবার অপরদিকে জাতিভেদ প্রথা এবং কালাপানি অর্থাৎ বিদেশ যাত্রার নিষেধের বিরোধিতাও করতে হয়েছিল। ধর্ম-সংস্কারকগণ সেদিন এ সব কিছুর বিরোধিতা করেছিলেন কারণ ঐ সব ধর্মীয় বিধিবন্ধন, প্রথাপার্ব্বণ সংস্কার, জাতিভেদ প্রথা সেদিনের ব্যক্তির স্বাতন্ত্র ও সাম্যের অধিকার নীতি-ভিত্তিক জাতীয় ঐক্যের বিরোধী ছিল।

ইংরেজ বিজয় ভারতের বিগত দিনের গতিহীন শ্লথ সমাজ-মানসে এক বিপুল সম্ভাবনা বহন করে আনে। ভারতে সেদিন ইংরেজ আগমণের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় জীবন যাত্রার তামস থেকে

বাহির বিশ্বের সূর্যালোকের স্পর্শ পেল। এরই প্রভাবে গ্রামীণ সংস্কৃতির ও অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বনির্ভর কাঠামো, প্রতিবাদহীন গ্রাম্যপঞ্চায়েতের শাসনব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র ও অন্য নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকৃত, এবং অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাভিচার দুষ্ট ভাবধারা সবকিছু ভেঙ্গে পড়তে লাগল। আগের মত জীবন আর নিশ্চল, নিথর রইল না। বৃটিশ শাসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীসমাজের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ মানস জগতের সঙ্গে উন্নততর সমাজ মানসের সংযোগ ঘটল। তাই সমাজ মানসেও সৃষ্টির উন্মাদনায় নতুন তাগিদ দেখা দিল। ইংরেজ বিজয় ভারতের সমাজ সংস্থার এক বিরাট পরিবর্ত্তন আনে ফলে যে জাগতিক ও মানসিক শক্তির মুক্তি ঘটে তা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে গণতন্ত্রের, ঐক্যের, সাম্যের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করে। বৃটিশ শাসন এদেশে যে আইন কানুন প্রবর্ত্তন করল তা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ এবং জাতিধর্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার, আইনের চোখে সকলেই সমান এই নীতি আশ্রিত। বৃটিশ শাসনের এই ল' এণ্ড অর্ডার এর দিকটাই সেদিন রাজা রামমোহনকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। প্রচলিত হিন্দু সামাজিক আচার আচরণ, নিষ্ঠুর বিধান, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তি, জাতিভেদ প্রথা রামমোহনের মনে নিজেদের পংকিল সমাজ জীবন সম্পর্কে ধিক্কার এনে দিয়েছিল। এই শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে ব্যবহারিক আচার আচরণ সামাজিক বিধিবিধান, আচরিত ধর্মকর্মে পরিবর্তনের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে তাই লিখেছিলেন, অসীম দুঃখের সাথে বলছি হিন্দুদের অনুসৃত ধর্ম্মব্যবস্থা তাদের রাজ-নৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধির পরিপন্থী। জাতিভেদ প্রথার ফলে সমাজ-জীবনে অসংখ্য রকমের বিভাগ উপবিভাগ তাদের মধ্যে রাজ-নৈতিক বোধ জাগাতে পারেনি এবং অসংখ্য রকমের ধর্মীয় আচার

অনুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্যের বিধি বিধানের ফলে হিন্দুরা অকর্মণ্য এবং কঠোর কাজের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। কাজেই আমি মনে করি, রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখভোগের উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মের কিছু পরিবর্জন করা উচিত (Raja—works)। অর্থাৎ, প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম কর্ম তাদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের পক্ষে পরিপন্থী। হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা তাদের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করেছে এবং অসংখ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হিন্দুদেরকে কোন প্রকার কঠোর কর্মের পক্ষে অনুপযুক্ত করে তুলেছে। কাজেই, রামমোহনের মতে, রাজনৈতিক সুবিধা ও সুখশান্তি লাভের জন্য প্রচলিত হিন্দু ধর্ম কর্মের রদ বদল হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এই ছিল সেদিনের যুগ মনোভাব। রামমোহনের মধ্য দিয়ে তার অভিব্যক্তি ঘটেছে প্রথম। তাই রামমোহন সম্পর্কে বলা হয়েছে Raja Rammohan inaugurated the Modern age in India.

অন্ধ-বিশ্বাস চার্চ, পুরোহিত, শাস্ত্র গুরুর রক্তচক্ষুর হাত থেকে মানব মানস মুক্তির যে আন্দোলনের আরম্ভ উত্তরকালে তাই-ই রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। মানব-ধর্ম ও গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে ধর্মের ও সমাজ সংগঠনের সংস্কার এই মানব ও মানস-মুক্তির আন্দোলনের প্রথম পর্যায় আর ভারতের এই নব আন্দোলনের পুরোধায় দেখতে পাই রাজা রামমোহনকে। মানস-মুক্তির প্রেরণাই রাজার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার মূল ভিত্তি। মানুষের সকল প্রকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম সাধক ছিলেন রাজা রামমোহন। তাই সেদিন অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার প্রভৃতি তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় জীবন-যাত্রার প্রভাবে মানুষ হয়েও রাজা রামমোহন সেদিন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। রাজনৈনিতিক স্বাধীনতার কত গভীর আকর্ষণ ছিল তাঁর জীবনে

তার পরিচয় পাই যখন দেখি ফরাসী বিপ্লবের সার্থকতার *(১) সংবাদ পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা; আবার স্পেনে স্বৈরাচারের *(২) পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের পত্তনের খবরে উল্লসিত রাজা টাউন হলে সাধারণের ভোজের আয়োজনে (৩) ব্যস্ত। শুধু তাই নয়, রামমোহন-মানসে রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব যে কতখানি ছিল তার নিদর্শন পেলাম যখন

*(১) "কুমারী কলেট বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড গমনকালে গুড হোপ অন্তরীপে গিয়া জাহাজে পড়িয়া গিয়া রামমোহনের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছে তখন ভগ্নপদ লইয়াই সেই জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন কবিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার জাহাজের কাপ্তেন অনেক নিষেধ করিলেন, সে নিষেধ তিনি কোন মতেই শুনিলেন না; ভগ্নপদে অতি কষ্টে ফরাসী জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন। আসিবার সময় ফ্রান্সের জয়ধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন। (Glory, Glory, Glory of France) (শিবনাথ শাস্ত্রী)। "ডিগবী সাহেব লিখিযাছেন যে, তাঁহার নিকট কর্ম করিবার সময় ডিগবী অনেক দেখিয়াছেন যে রামমোহন রায় ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন,যদি দেখিতেন যে, স্বাধীনতা-পক্ষের পরাজয় হইতেছে তাহা হইলে দরদরধারে তাঁহার দুই কপোলে অশ্রুধাবা বহিত।" (শিবনাথ শাস্ত্রী)

*(২) এ তথ্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, ঘটনাটি স্পেনে ঘটেনি, ঘটেছিল দক্ষিণ আমেরিকায়। স্পেন সরকার দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতে যথেচ্ছাচার করত। ১৮২৩ সালের গণ-সংগ্রামে এই উপনিবেশসমূহ স্বাধীনতা লাভ করে এবং গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

*(৩) আবার কেউ কেউ বলেন, এই ভোজ সভা রাজার নিজ গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভোজ-সভায় উপস্থিত প্রায় ষাট জন অতিথির সম্মুখে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজা বলেছিলেন, "What! Ought I to be insensible to the suffering of my fellow creatures wherever they are, or however unconnected by interests religion or languages?

১৮২১ সালে নেপলসের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবসান সংবাদ শ্রবণে রাজা মর্মাহত হয়ে ইংরেজী সংবাদপত্র 'Calcutta Journal'এর সম্পাদক মিঃ বাকিংহামের সাথে সাক্ষাৎ বাতিল করে দিলেন। এই প্রসঙ্গে রাজা লিখলেন, "From the late unhappy news, I am obliged to conclude that I shall not like to see liberty universally restored to the nation of Europe and Asiatic nations, especially those that are European Colonies possessed of a greater degree of the same blessings than what they now enjoy. Under these circumstances, I consider the cause of Naepolitans as my own and their enemies as ours. Enemies to the liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successfull. (works—Raja Rammohan Ray). আবার দেখি, ইংলণ্ডের পার্লমেণ্টে যখন প্রথম রিফর্ম বিল আলোচনার জন্য উঠেছে তখন রাজা রামমোহন তাঁর জরুরী কাজকর্ম ত্যাগ করে পার্লামেণ্টের রিফর্ম বিল যাতে পাশ হয় সেদিকে নজর দিলেন। তিনি সেই সময় উইলিয়ম রাথবেনেকে যে পত্র লেখেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রিফর্ম বিল পার্লামেণ্টে পাশ হবার পর তিনি লিখেছিলেন, যেহেতু আমি প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করেছি, যদি Reform Bill পার্লামেণ্টে পাশ না হয় তবে তোমাদের দেশের সাথে আমার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেব, তাই পার্লামেণ্টের ফলাফল না জানা অবধি তোমাদের বা লিভারপুলের অন্য কোন বন্ধুকেই আমি পত্র লিখিনি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পশ্চিমী জগতে আইন সার্বভৌমের আদেশ অথবা বহুদিনের আচরিত রীতিনীতিই আইনে রূপ নেয়,

এই প্রশ্নে অনেক বিতর্ক চলেছিল। এই প্রসঙ্গে এ্যানালিটি-ক্যাল স্কুলের প্রখ্যাত অষ্টিন এবং হিস্টরিক্যাল স্কুলের স্যাভাইনির (Savaigny) অবদান রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের কাছে আজও স্মরণীয়। অথচ প্রায় ঠিক একই সময়ে রাজা রামমোহন আইনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা যে শুধু গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, তা পশ্চিমী আলোচনার সমধর্মী। রাজা তাঁর "Essay on the Rights of Hindus over ancestral Property" বইতে লিখলেন," In every country, thus determining the rights of succession to and alienation of property first originated in the conventional choise of the people, or in the discretion of the highest authority secular or spiritual, and those rules have been subsequently established by the common usage of the country and confirmed by judicial proceedings (Works P·394). এই উক্তির মধ্যে পশ্চিমী জগতের হিস্টরিক্যাল এবং অ্যানালিটিক্যাল উভয় মতবাদের সারকথা আমরা পাই।

ভারতে ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ-মানসে একদিকে যেমন "বেদে আছে মনোভাবে"র পরিবর্তে যুক্তিবাদ ও মানব-ধর্মের আবির্ভাব ঘটল তেমনি অপরদিকে গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাবও মানস-জগতে বিশেষ করেই উপলব্ধি করা গেল। আর রাজা রামমোহনের রাষ্ট্রীয়-মানসের মধ্যে দিয়েই তার প্রথম পরিচয় আমরা পেলাম। রাজা রামমোহনের কর্ম, চিন্তা ও মানস-জীবন "রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখশান্তি" লাভের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা প্রভাবিত। এই রাজ-নৈতিক সুবিধা বা কোনপ্রকার অধিকারের সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোতে কোন ঠাঁই ছিল না। তাই গণতন্ত্রের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশতই সেদিন ভারতে ইংরেজ-বিজয়কে ঈশ্বরের

আশীর্বাদরূপে জ্ঞান করেছিলেন। "খৃষ্টান জনসাধারণের নিকট সর্বশেষ আবেদন-এ তিনি ইংরেজের মাধ্যমে এই হতভাগ্য দেশকে তার পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তাদের স্বৈরাচারী অত্যাচার থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।" ইংরেজের সাহিত্যদর্শন ও ব্যবহারিক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে যে নতুন জীবনাদর্শের আস্বাদ পেলেন, যে যুক্তিবাদ ও মানবধর্মের আদর্শের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল তাতে তিনি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে এ-কথা পর্যন্ত বলেছিলেন ইংরেজ এমন জাত যারা শুধুমাত্র নিজেরা নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদি উপভোগ করে না, যে দেশে তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় সেখানেও স্বাধীনতা, সামাজিক সুখ-শান্তি, সাহিত্যও ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষা চর্চা অনুশীলন ইত্যাদির ব্যবস্থাদি করে।

উনবিংশ শতাব্দীর এই নতুন জীবন-ধর্মের তাগিদেই ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত—একথা বলেছি। একথাও বলেছি, আমাদের দেশে এই ধর্ম-সংসার আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ ঘটে রাজা রামমোহন-মানসে। বিদেশী সাহিত্য দর্শন ও সমসাময়িক রাজনৈতিক বিপ্লব রাজা রমামোহনের মানসে একথা স্পষ্ট করে তুলেছিল, হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা যা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার পরিপন্থী এবং যে অসংখ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হিন্দুদেরকে কোন প্রকার কঠোর কর্মের পক্ষে অনুপযুক্ত করে তুলেছে তার পরিবর্তন আসা উচিত অন্তত ব্যবহারিক রাজনৈতিক সুবিধাদির জন্যও।

*A nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty but also interest themselves in promoting liberty and social happiness, as well as free enquiry into and religious subjects among those nations to which the influence extends.

[Works—রাজা রামমোহন রায়]

রাজা রামমোহনের মানস-জীবন গড়ে উঠেছে একেশ্বরবাদী ইংরেজ ও মুসলমান রাজকর্মচারী ও পণ্ডিতদের সাহচর্যে। তিনি ছিলেন বৃটিশ দার্শনিক বেন্থামের অনুরাগী ভক্ত—সম্ভবত ভলটেয়ার-সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। এছাড়া, 'স্বাধীনতা, সাম্য-মৈত্রী'র জীবনাদর্শ প্রভাবিত ফরাসী-বিপ্লব দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত তাঁর মানস-জীবন ইতিমধ্যে আপন সংকীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করবার শক্তি সংগ্রহ করেছে। যতই মানুষ তার সীমাবদ্ধ গণ্ডি লঙ্ঘন করে, বহু জাতের নানা মানুষের বিভিন্ন সমাজ-মানসের সাহচর্যের মাধ্যমে তার গণ্ডীবদ্ধ মানুষের সীমা ছাড়িয়ে আর সকল মানুষের মধ্যে ক্রিয়া-কর্ম, স্নেহ-মমতা, অনুভূতি, হৃদয়বৃত্তির ঐক্য ও মিল অনুভব করে ততই সে সংকীর্ণতার বিরোধ থেকে উত্তীর্ন হয়, ততই সমগ্র মানবজাতির ও তাদের সৃষ্টিকর্তার একত্বে সে নিঃসন্দেহ হয়। সমগ্র মানুষ এক—তাদের সৃষ্টিকর্তাও এক—মানব-ধর্মই সবার ধর্ম—সমাজ-মানস-বিবর্তনের ধারাই এই। রাজা রামমোহনের মানস বিশ্লেষণ করলে এই সত্যই প্রতিভাত হয়।

রাজা রামমোহন মূলতই গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। য়ুরোপে ১৮-১৯ শতকে মানবতাবাদ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল, সেই অর্থেই রাজা রামমোহন মানবতাবাদী। বর্তমান পৃথিবীকে অস্বীকার, সবকিছু সুখ ও শান্তির স্থান পরলোক, শাস্ত্র-গুরুর নির্দেশ অন্ধের মত মাথা পেতে নেওয়ার যে ধর্ম তার বিরুদ্ধে যে যুক্তিবাদী মানস, বিজ্ঞান ও শিল্প-বিকাশের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল রাজা রামমোহন-মানস সেই উপাদানেই পরিপুষ্ট।

রাজা রামমোহনের আবির্ভাবকালে দেখেছি বিগত অর্থনৈতিক কাঠামো ভগ্নোন্মুখমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিপর্যস্ত—সাধারণ মানুষ জীবন-সংগ্রামের কঠোরতায় কাতর। পুরাতন জীবন-ধর্মের আহ্বান মানুষের কাছে ক্রমশই ক্ষীণতর হয়ে এসেছে—

অথচ পাশাপাশি নতুন জীবন-ধর্মের আহ্বান তখনও শোনা যাচ্ছে না। মানুষের মন বিভ্রান্ত—বাস্তব জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত, মানুষ তাই বাস্তব-জীবনের ভীষণতা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে, উদ্যমহীন হয়ে 'বৈরাগ্যমেবভয়ং' মনে করে সংসার মায়া, মোক্ষই একমাত্র উদ্ধারের পথ বলে মেনে নিয়ে সেদিনের দুঃখকে জয় করবার প্রচেষ্টা থেকে পেছিয়ে পড়লেন। আমাদের দেশে ১৯ শতকে সামন্ত-যুগীয় সমাজ ও অর্থনীতির সংক্রান্ত কালে এই সংকট দেখা দেয়। জগতের বিভিন্ন জাতির সামাজিক ইতিহাসে এই সঙ্কট নতুন নয়। য়ুরোপ, ইংল্যাণ্ডের সমাজ ১৬-১৭ শতকে ঠিক এই রকম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল—সেদিন সামন্ত-যুগীয় অর্থনীতি ও সমাজ-কাঠামোর পক্ষে ক্রমবর্ধমান জন-জীবনের চাহিদা মেটান ক্রমশই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ার ধারা কিন্তু একই পথে প্রবাহিত হয়েছিল—শাস্ত্র-গুরুর নির্মম শাসন, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মের আফিংয়ের প্রভাবে ভগ্নোন্মুখ সমাজ-কাঠামোয় বিপর্যস্ত মানুষ বাস্তব-জীবন ছেড়ে পরলোকই সকল সুখ-শান্তির ঠাঁই মনে করে উদ্যমহীন হয়ে বসে রইলেন। ক্যাথলিক ধর্মের ইতিহাসের কথা পাঠককে স্মরণ করতে বলি। কিন্তু পাশাপাশি জীবনকে নতুন সুন্দর ও বলিষ্ঠ করে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাও অনুভূত হলো। দেখা দিল, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও শিল্প বিপ্লবের ব্যাপক প্রসারতা। য়ুরোপ ইংলণ্ডের মানস-জীবনেও তাই সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব যেন দেখা দিল। সাংস্কৃতিক জগতে রেনেসাঁ আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটল। এই বিপ্লব প্রাথমিক অবস্থায় রূপ নিয়েছিল ধর্ম সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। প্রোটেষ্টাণ্টবাদেও ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করবার আন্দোলন শুরু হলো। ক্রমশই পুরাতন সামন্তযুগীয় স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রকে ভেঙ্গে গণতান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্র কাঠামোকে গড়ে তোলবার বিপ্লব দেখা দিল

য়ুরোপের দেশে দেশে। 'সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র অমৃতবাণীর আস্বাদ পেল মানুষ। মানুষই মানুষের আদর্শ, মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুখী করে গড়ে তোলা মানুষেরই অধিকারের মধ্যে—এর জন্য অতি প্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক শক্তির দুয়ারে ধর্ণা দিলে চলে না—এই বিশ্বাস থেকেই আধুনিক হিউম্যানিজিমের আবির্ভাব ঘটে। এই পার্থিব জগতে এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বকীয় প্রচেষ্টাতে প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদের আহরণ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ও যুক্তিবাদের (Democracy and reason) সাহায্যে সর্বাঙ্গীন ও সর্বজনীন মঙ্গল কামনা ও প্রতিষ্ঠা করাই সেদিনের হিউম্যানিজিমের মতবাদ হিসাবে দেখা দিল। সামাজিক মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই ধর্মের দোহাই দিয়ে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির সাহায্যে সামাজিক সংকট এড়ান যাবে—আগের দিনের এই ধারণার আর ঠাঁই রইল না সমাজ-মানসে। রেণেসাঁ মানব-ধর্ম্ম মূলতঃই মধ্যযুগীয় খৃষ্টধর্ম্মের পরকাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ব্যক্তিগত অবিনশ্বরতা নিয়ে মত্ত থাকার পরিবর্ত্তে ইহজগতেই সুন্দর ও সুখী জীবন গড়ে তোলাই এই রেণেসাঁ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। সার্থক রেণেসাঁর পক্ষে সার্থক মানুষ আর সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী নয়, এক নতুন ধরণের মানুষ-সার্ব্বিক মানুষ। বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী লিওনার্দো দ্যভিঞ্চি এবং মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর মধ্যে সেদিন এই মানবধর্ম মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এই হিউম্যানিজমের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ধর্ম-শাস্ত্রগুরু চার্চের নিয়ন্ত্রণ থেকে মানস-মুক্তির সুদৃঢ় আহ্বান এতে পাওয়া গেল।

ভারতবর্ষের উনবিংশ শতকেও অনুরূপ পরিবেশের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ—প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের খ্যাতি জগৎময়। আর তাই ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় অর্থ-নীতির স্থায়িত্বকাল য়ুরোপের দেশগুলির তুলনায় দীর্ঘায়ত হলো।

১৮ শতকের শেষার্ধ থেকেই সামন্ত-যুগীয় অর্থনীতির ব্যর্থতা জন-জীবনে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হলো। বৃটিশ আগমনের পূর্বে ভারতের সমাজ-সংস্থায় ব্যক্তির নিরপেক্ষ কোন স্বাধীন সত্তা বা অস্তিত্ব অস্বীকৃত ছিল—পরিবার ছিল সেদিন সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক ইউনিট বা একক। তাই সেদিন ব্যক্তি-মানস ছিল পরিবার নির্ভর ও পরিবার শাসনাধীন। আবার এই পরিবারের মানস ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রিত—তার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। তার শাসন-ক্ষেত্রের সীমানা খুব বিস্তৃত ছিল না এবং সেইজন্য তার বিধি নিষেধ ছিল নির্মম প্রতিবাদহীন—তার ন্যায়-অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল ছিল না। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধের কোন ঠাঁই থাকা এ সমাজ-জীবনে সম্ভব নয়। এই প্রকার ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ জীবন-যাত্রায় প্রতিবাদহীন স্বৈরাচারী বিধিব্যবস্থা সৃষ্ট পরিবেশ ও সমাজ-মানস সেদিন ইংরেজ প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা, সামাজিক বিধিব্যবস্থা, ল এণ্ড অর্ডারে নতুন বিধি নতুন আদর্শ নতুন প্রবর্তিত ভূমি-সম্পর্ক ইংরেজের ব্যক্তিগত সাহচর্য্য এবং তাদের আনা শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্র-বোধ মানব-ধর্ম এবং যুক্তিবাদের নতুন জীবনাদর্শের অভূতপূর্ব আস্বাদ লাভ ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় আমূল ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হল। আমাদের সমাজ ইতিহাসে সেই সন্ধিক্ষণে ব্যক্তির প্রথম পরিবার প্রথা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের শাসন চৌহদ্দির নিয়ন্ত্রন-মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করবার অধিকার লাভ করল। সেদিন মানুষ অনুভব করল—সেও মুক্ত এবং স্বতন্ত্র। তাই সেদিন রাজা রামমোহন বৃটিশ আগমন ও শাসনকে 'ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ' বলে স্বাগত জানালেন। এই উক্তির মধ্যে মানব ও মানস মুক্তির কি গভীর আকুতিই ফুটে উঠেছে! "খৃষ্টান জনসাধারণের নিকট সর্ব্বশেষ আবেদনে তিনি ইংরেজের মাধ্যমে এই হতভাগ্য তার পূর্বতনশাসন-কর্তাদের স্বৈরাচারী অত্যাচার থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ধার করবার জন্য ঈশ্বরকে

আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।” ইংরেজের সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি পাঠ করে যে নতুন জীবনাদর্শের আস্বাদ তিনি পেয়েছিলেন তাতে ইংরেজ জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বললেন, “ইংরেজ এমন এক জাত যারা শুধুমাত্র নিজেরাই রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ভোগ করে না, যে সব দেশে তার প্রভাব বিস্তৃত হয় সে সব দেশেও স্বাধীনতা, সামাজিক সুখ শান্তি, সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষচর্চা ও অনুশীলন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে।”

এ থেকেই স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা করতে পারি, যে রাজার ধর্মমত সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক গন্ধ বিমুক্ত। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন তা কোন প্রকার সম্প্রদায়গত মনোভাব বা ক্ষুদ্রতা বিমুক্ত ছিল। ভারতবর্ষের উত্তরকালের রাজনৈতিক মানসের বিকাশে অর্থাৎ জাতিয়তাবোধের বিকাশে সাম্প্রদায়িকগন্ধ বিমুক্ত ধর্মমতের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। রাজার নির্দেশ ছিল, কোন সাম্প্রদায়িক নামে পরব্রহ্মের পূজা উপাসনা চলতে পারে না। তিনি তাঁর পরব্রহ্ম ঈশ্বরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, “My God renders religion destructive of differences and dislike between man and man and conducive to the peace and union of mankind.”

এমনি করেই সেদিন আমাদের মধ্যযুগের গ্রামকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র-গণ্ডীবদ্ধ নিস্তব্ধ সমাজ ও সংস্কৃতিকে একদিকে যেমন ইংরেজ বণিকের কামান বন্দুক, তার যন্ত্রচালিত সভ্যতা ধ্বংসের ভেতর দিয়ে সৃষ্টি করেছিল বাহিরের দিক থেকে, অপরদিকে, রামমোহন সৃষ্টি করেছিলেন ভেতরের দিক থেকে। ধর্মীয় ক্ষুদ্রতা, কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের মূলে আঘাত করে, যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রবর্তন করে ও সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়ে এবং জাতি, ধর্ম, বিত্ত নির্বিশেষে সকল মানুষ এক, এই ধারণা প্রচারের মধ্যে রাজা

সেদিন বাংলা তথা ভারতের নিশ্চল নিস্তব্ধ সমাজ-মানসে এক অভূতপূর্ব গতি ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, জীর্ণ পুরাতনকে অস্বীকার করবে, প্রাচীনকে ভেঙ্গেচুরে নবীন আদর্শে নতুনকে গড়ে তুলবে !

তাই বাংলা তথা ভারতের নবযুগের নতুন মানুষ রামমোহন। রাজার ধ্যান ধারণা, চিন্তা ও কর্ম শ্লথ সমাজ মানসকে গতিশীল করেছে। ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ইংরেজ-শাসন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে যে নতুন বিকাশ পথে পরিচালিত করে দিয়েছিল, রামমোহন তার উপযোগী সমাজ-মানস সৃষ্টি করে সে বিকাশধারাকে সফল করতে চেয়েছিলেন।" (ভারত পথিক)

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ ও ভারতের ভবিষ্যত শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে ঘোরতর আলোচনা চলছিল। তখন 'ভারত-শাসন পরিকল্পনা—একটি নাটক' নামে একটি রসরচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ রসরচনায় বলা হয়েছিল, ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদ দেওয়া হোক রাজা-রামমোহনকে, বিচার বিভাগের সমস্ত পদ মুসলমানদের দেওয়া হোক; আর রাজস্ব বিভাগে পদগুলি হিন্দুদের এবং পুলিশের পদগুলি বৃটন বা ইঙ্গভারতীয়দের দেওয়া হোক। তারপর বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনার আকর্ষণীয় দিক হলো, রাজা হিন্দুও নন মুসলমানও নন, আবার, খৃষ্টানও নন—কাজেই কোন সম্প্রদায়ের প্রতিই তিনি পক্ষপাতিত্ব করবেন না। (The beauty of this plan, ladies and gentlemen, consists in this: the Raja is neither a Hindoo, a Mahomedan, nor a Christian, so that he can have no bias towards any part of the population of India.) এ চিত্রের মধ্য দিয়ে রাজা রামমোহন-মানসের স্বরূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তা হলো—রাজা হিন্দু নন, মুসলমান, খৃষ্টান নন—কোন সম্প্রদায়েরই

নন—তিনি মানুষ—আর এই মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ ও সংস্কারের সকল ক্ষুদ্রতার উর্ধে। এই মানুষই ভারতীয় সমাজ-মানসের নতুন যুগের নতুন মানুষ।

য়ুরোপেও প্রাক্ শিল্পবিপ্লব যুগে এমনি ধারা আন্দোলনের আবির্ভাব দেখেছি। একথা জানি, প্রাচীন মধ্যযুগীয় ধর্ম-কর্ম অনুন্নত নিম্নস্তরের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাই অন্ধবিশ্বাস, নিরাশাবাদ স্বৈরতন্ত্র কুসংস্কার এই দিনের মানুষের চিন্তা ও কর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। তাই দেখি, য়ুরোপে জাতীয় অভ্যুত্থান মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধর্মকর্মের (Feudal religion) বিরুদ্ধে ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবেই প্রথম পর্যায়ে রূপ নিয়েছিল। ফরাসী দেশে ভলটেয়ার, রুশো, হেলভিটাস, হলবাক্ এবং আরও অনেকে সামন্ততন্ত্রগত অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক ধারক রোমান চার্চের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ সুরু করেন। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সার্ব্বিক রাজনৈতিক বিদ্রোহের পূর্বসূরী এই ধর্ম্মবিরোধী আন্দোলন।

এই আন্দোলন পরবর্ত্তী পদক্ষেপ সমাজ-সংস্কার গত আন্দোলনের। ভারতে এই আন্দোলন পরে যাঁকে দেখি তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর রাষ্ট্রীয়-মানস

ঊনিশ শতকের মানস-বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছিল সেদিন আত্মোপলব্ধি জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও জীবন জিজ্ঞাসার নূতন ধর্ম্মে —মানবধর্ম্মে, মানবতা বোধে যার সার্থক পরিণতি ঘটে। শিল্প-বিপ্লব ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কিছুদিন থেকেই মানুষের ধর্ম্মান্ধতা ও অন্ধবিশ্বাসের মূলে যে আঘাত হানছিল তার ফলে প্রাচীন জীবনায়নে ও সমাজমানসে অতীত জীবনদর্শনের প্রভাব

দ্রুতগতিতেই নিঃশেষ হয়ে চলেছিল। সেদিন যেমন বিজ্ঞানের বিকাশ ও শিল্পবিপ্লবের ফলে জীবন সংগ্রামের পথ সুগম ও সুন্দর হ'য়ে উঠেছিল; অপরদিকে তেমনি নূতন পরিবেশ সৃষ্ট সমাজ মানসেও সত্য, সুন্দর ও মানব মঙ্গলের প্রতিষ্ঠার উদ্যম ও সাধনা প্রায় সকল দেশের সমাজ সংস্কৃতির অন্যতম বিশিষ্টরূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিলো। ভারতীয় সমাজ মানসেও সেদিন এই আকুতি নানাভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। তবে একথাও স্বীকার্য্য, এই মানব ও মানস মুক্তির উদ্যমের সাথে অতীতের সংস্কারাবদ্ধ জীবনায়ন ও 'বেদে আছে' মনোভাবের দ্বন্দ্বও প্রকট হ'য়ে উঠেছিল। সেদিন বহুকাল অর্জিত সংস্কার অন্ধ সংস্কাররূপে জীবনকে পঙ্কিল ও শ্লথ করে তুলেছিল। এর মূলে ছিল একদিকে দেউলে হওয়া বিগতদিনের গতিহীন জীবনায়ণের প্রতি মোহগ্রস্ত সমাজমানস এবং অপরদিকে সেদিনের বিদেশী শাসন ও শোষণ সৃষ্ট অর্থনীতিক জীবনযাত্রা। কালের গতির সাথে এ জীবনযাত্রা গতিশীল না হয়ে সেদিনের বিদেশী শাসন-চক্রান্তে মূমূর্ষু সামন্তযুগীয় সমাজ ও অর্থনীতিক ব্যবস্থার জীর্ণ উপাদানের জগদ্দল পাথরের তলে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল। সমাজ-মানসে এই প্রতিক্রিয়া দুটি ধারায় প্রবাহিত হ'ল একটি নেতিবাচক এবং অপরটি অস্তিবাচক। সমাজ-দর্শনের প্রতিটি সংকটের প্রতিক্রিয়ার প্রবাহধারা সর্বক্ষেত্রে ও সর্বকালে প্রথমে এই দুইটি পথেই প্রবাহিত হয়—কিন্তু ক্রমশঃই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রকট হ'য়ে দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, সমাজ সংস্কৃতি যে ক্ষেত্রে গতিশীল যেখানে নেতিবাচক প্রবাহধারা ক্ষীণতর হ'তে হ'তে নিঃশেষ হ'য়ে যায়—অস্তিবাচক প্রবাহধারার জয়যাত্রা হয় সুরু।

নবযুগের আদর্শ—জীবনকে জানা,মানব ও মানস মুক্তির প্রবল কামনা প্রখর হয়ে উঠে—মানুষের কাছে এঁদের আহ্বান পৌঁছয়।

এই প্রাচীনের সাথে নবীনের মৃত্যুর সাথে জীবনের দ্বন্দ্ব এত চিরন্তন-নবনব অবস্থায় তা নব নব রূপ নেয়। একদিকে শাস্ত্র-গুরু ও ব্রাহ্মণে ভক্তি এবং অন্ধসংস্কার—আর অপর দিকে মানব ও মানস মুক্তির যুদ্ধ ঘোষণা। এই দুই বিপরীত মানসের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই সেদিনের নবযুগের যাত্রার উদ্বোধন ঘটে। সেদিন দ্রষ্টা রামমোহন আর স্রষ্টা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাসবেত্তা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলছেন, 'একদিকে স্বার্থপরতা জড়তা, মুর্খতা—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয় শূন্যতা নিজ্জীব জাতির নিশ্চলতা, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির ফল, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ; একদিকে নিজ্জীব নিশ্চল তেজোহীন বঙ্গসমাজ, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' থেকে উদ্ধৃত)

ইংরেজ প্রবর্ত্তিত শাসনব্যবস্থা ও রীতিনীতি এবং তাদের নিয়ে আসা জীবনাদর্শ, তাদের অনিচ্ছাতেই বা অজ্ঞাতসারেই প্রচলিত ভারতীয় সমাজমানসে ও সমাজব্যবস্থায় যে কি পরিবর্ত্তন সাধিত করে দিলে তার পরিচয় পূর্বে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হ'লে সেদিনের সেই পরিবেশ আমরা যেন স্মরণ রাখি।

ইংরেজের অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন, দাসত্বের বন্ধনের ইতিহাস বিস্মৃত হবার নয়—তবে একথাও সত্যি সেদিন তারা তাদের অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছায় যে মানব ও মানস মুক্তির বানী বহন করে এনেছিল, ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ইতিহাসের পুঁথি পত্র ও পঠন পাঠনের মাধ্যমে হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ তার অপূর্ব্ব আস্বাদ লাভ করেছিলেন—আর এ ব্যাপারে প্রিয়তম

শিক্ষক ডিরোজিওর সাহচর্যও মুখ্য ছিল। সেদিন তাঁদের এই প্রিয়তম শিক্ষকের দৃঢ় কণ্ঠ থেকে মানসমুক্তির ও সত্যনিষ্ঠার জীবনাদর্শের যে বানী নিঃসৃত হয়েছিল, তাই সেদিন এই তরুণদের চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে বলেছিল, 'তোমরাও স্বাধীন—সত্য-নিষ্ঠায় তোমাদের জীবন গঠন কর। টম পেইনের Age of peason সেদিন এই তরুণদের 'বেদ' 'বাইবেল' হয়ে উঠলো।

হিন্দু কলেজ সেদিন ছিল এই আবর্ত্তের কেন্দ্রস্থল এবং হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রবৃন্দ ছিল তার নায়ক। তখন কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত কলেজে একান্তভাবেই পাঠে নিমগ্ন। বিদ্যাসাগরকে সেদিন সংস্কৃত কলেজের একনিষ্ঠচিত্তে পাঠরত ছাত্রহিসাবে দেখা গেল। অধ্যাপকশ্রেণী ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাবত্তায় বিস্ময়ে হতবাক্। একথা শোনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র নাকি এসময়ে সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম বিস্মৃত হয়েছিলেন জানিনা সেদিনের সমাজ বিক্ষোভের প্রভাব এতে কতটা।

কালের সেই তীব্র অন্তরপ্রেরণা, সেই যুগপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে তীক্ষ্ণধী তীব্র আত্মচেতনাসম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। বার বৎসরের সংস্কৃত অধ্যায়ন অধ্যাপনা নিষ্ফল হয়ে গেল। হিন্দু ধর্ম্ম কর্ম্ম শাস্ত্রাদি ও জীবনায়ন বিদ্যাসাগর মানসপটে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হ'ল না। ইংরেজের মানব ও মানস মুক্তির বাণী, সামাজিক বিধি বিধানের মর্ম্মবাণী, তাদের বলিষ্ঠ কুসংস্কারজয়ী মনন ও মানবধর্ম্মের জীবনাদর্শ তাঁর চিত্তকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল তাই সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ তখন দেখি, তাঁর মনন, কর্ম্ম ও জীবনধারার মধ্যে দিয়ে সেদিনের যুগ প্রবৃত্তির কালের অন্তর-প্রেরণা অধিকতর গভীর সামাজিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় মনন ও জীবনের মূলভিত্তিই সমাজ। ভারতের সমাজ মানসের সেইক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাব যে'ক্ষণে আমাদের সমাজ মানসে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে রাষ্ট্রনৈতিক সাধনা তখনও সুরু হয়নি। রামমোহন যাত্রা সুরু করেছেন--য়ুরোপ তখন নূতন জীবনাদর্শের বানী নিয়ে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছে। স্বৈরাচারী সামন্ত তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন ক'রে গণতন্ত্র এবং সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের জয়যাত্রা সূরু হয়েছে। প্রথমে রামমোহন, পরে দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর কেশবসেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম, মাইকেল প্রভৃতি নব্যযুগীয়েরা এই নূতন জীবনবাদকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। সেদিন য়ুরোপ জীবনাদর্শের যে নূতন বাণী বহন করে এনেছিল বিদ্যাসাগর তা শুধুমাত্র যুক্তি দ্বারা চেতন দ্বারা, উপলব্ধি করেই ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি। নানব ধর্ম্মের তীব্র অনুভূতির প্রেরণায় তিনি সক্রিয়ভাবে সেদিন সকলপ্রকার বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও নূতন জীবনাদর্শকে সকল মানুষের মানসে প্রতিষ্ঠার কামনায় রত হলেন। একটি কথা সেদিনের ভারতীয় সমাজ মানসের ইতিহাস গত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই কথাই পরিস্ফুট হয় যুগধর্ম্মের প্রভাব এ জাতির উপরিস্তরে যত তরঙ্গই উত্থিত হোক, তলদেশে একটা গভীরতর আকুতি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল। এই যে আকুতি এই যে উদ্দীপনা তার মূলে ছিল, নূতন জীবনবোধ। এই জীবন বোধের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানবজীবনে গৌরববোধ, জীবন জিজ্ঞাসা, মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান, মনুষ্যজীবনের মাহাত্ম্য ঘোষণা, মানুষই মানুষের আদর্শ ও মানবতাবোধের আদর্শই সকল আদর্শের মূল। বিদ্যাসাগর মানসে এই জাগরণ রূপায়িত হয়েছিল।

উনিশ শতকের সমাজমানসের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার মাপ কাঠিতে বিশ্লেষণ করলে প্রধানতঃ দুটি উপাদান চোখে পড়ে,

একটি বলিষ্ঠ মানসিকতা ও স্বজাতি সচেতনতা এবং অপরটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধ। প্রথমটি রূপ নেয় জাতীয়তা বোধে এবং পরেরটি গণতান্ত্রিক বোধে ও ভাবধারায়। বিদ্যাসাগর মানসেই এই দুই বোধ মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। রামমোহনের জীবিত কালেই বিদ্যাসাগরের জন্ম—তাই দেখি, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ছিল রাম-মোহন প্রভাবিত। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য, ধর্ম প্রচার বা ধর্ম্ম সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেন নি—আধ্যাত্মিকা, অলৌকিকতা, অজ্ঞানতা ও অদৃষ্টবাদের পঙ্কিল আবর্ত্ত থেকে সেদিনের জনমানসের মুক্তির উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, মানবদরদী, চিন্তানায়ক ও কর্ণধার। সেদিন তাঁকে বিদেশী শাসক ও দেশী সমাজ উভয়ের প্রতিকুলতার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল এবং এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। যাঁরা একথা বলেন, ইংরেজের অনুগ্রহ ছাড়া, আমাদের দেশবাসী আধুনিক সাংস্কৃতিক আস্বাদন থেকে বঞ্চিত থেকে যেত—তাঁদের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের সাথে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগ্রামের কাহিনীটি স্মরণ করতে বলি। ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ফলে এদেশের মানুষের মনে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সহায়ক হ'তে পারে এই আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার সেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্ত্তে দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে এদেশে প্রচলিত রাখবার জন্য অর্থব্যয়ের সংকল্প করেছিলেন। তখন রামমোহন এই শিক্ষার অশুভ ফলের কথা স্মরণ করে বিচলিত হন এবং এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও শাসকবর্গের এই কুটিল অপচেষ্টার সম্মুখীন হতে হয় এবং তাঁর প্রতিবাদ সেদিন প্রতিরোধের পর্য্যায়ে গিয়ে

পৌঁছায়। সরকারী শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত থেকেও সরকারী উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সংগ্রাম কবে তাঁর স্বকীয় পরিকল্পনানুযায়ী বাংলা শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন যাতে এই পঠন পাঠনেব মাধ্যমে দরিদ্র অজ্ঞ দেশবাসী সেদিনের নূতন জীবন বোধ ও আধুনিক সংস্কৃতির আবেদন লাভ করতে পারে। সেই সময়কার শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট তিনি যে পদত্যাগ পত্র পেশ করেছিলেন তা একদিকে যেমন জাতীয়মর্য্যাদা বোধের পরিচায়ক অপর দিকে তেমনিই মিশনারী মার্কা সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

জাতীয়মর্য্যাদা বোধ বিদ্যাসাগব মহাশয়ের মন ও ভাবধারার অন্যতম বৈশিষ্ট। এই মর্য্যাদাবোধ তিনি আজীবন অক্ষুন্ন রেখে ছিলেন। আমাদের সমাজ জীবনে সেদিন সাহেবীয়ানার প্রবল বন্যা, ইংবেজীশিক্ষাব অনুরাগী য়ুরোপাগত জীবনাদর্শের পুজারী বিদ্যাসাগব কিন্তু এই বন্যায় ভেসে যাননি। নতুন জীবনাদর্শের সত্যটিকে তিান উপলব্ধি কবে নিজের দেশেব জল হাওয়া মাটির উপাদানে তাব প্রতিষ্ঠাব আয়োজন কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর চরিত্র পূজা পুঁথিতে—'আমাদের দেশের প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশেব মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লাভ কবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগব সাহেবের হাত হইতে শিবোপো লইবার জন্য কখনো মাথা নত কবেন নাই। তিনি আমাদেব দেশের ইংবেজ-প্রথা গর্ব্বিত সহেবানুজীবিদের মত আত্মাবমাননার মুল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একবার তিনি কার্য্যোপলক্ষে হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সঙ্গে দেখা কবতে গিয়েছিলেন। সভ্যতাঅভিমানী সাহেব তাহার বুট বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপর উর্দ্ধগামী করিয়া দিয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতা রক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার সাহেব কার্য্যবশতঃ

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটি জুতো সমেত তাঁহার সর্ব্বজন বন্দিত চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরেজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন।"

ইংরেজী শিক্ষা ও সেই শিক্ষাবাহিত জীবনাদর্শের অনুরাগীই শুধু নন, তার প্রচারক ও বাস্তবে তার রূপায়নের সংগঠক বিদ্যাসাগরের ভাবধারায় ও জীবনযাত্রায় কোন ক্ষেত্রে কোন দিনও বিদেশীর মিথ্যা অনুকরণ স্পৃহা কিন্তু স্পর্শ করতে পারেনি। তাই একথা বলা চলে—বিদ্যাসাগর মানস ও জীবনযাত্রায় সেদিনের সদ্য উন্মেষিত জাতীয়তাবোধ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। তাই উত্তরকালেব জাতীয়তাবাদের শিক্ষায় বিদ্যাসাগর অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

বিদ্যাসাগরের রাষ্ট্রনৈতিক মানসের অন্যতম উপাদান তাঁব মানবতা বোধ, যুক্তিবোধ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ। মানবতাবোধের প্রেরণায় সেদিন যা কিছু কাজ সমাজ মঙ্গলের জন্য করণীয় ও সত্যবলে তিনি মনে করেছেন তা সম্পাদন করতে তিনি সামাজিক, ধর্মীয়, শাস্ত্রীয় কোন বাধাই সেদিন গ্রাহ্য করেন নি।

১৮৫৩ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েই যে কাজটি করেছিলেন, তা একদিকে যেমন তাঁর বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় দেয়, অপরদিকে তেমনিই তাঁরা গণতান্ত্রিক মানসিকতার সাক্ষ্য বহন করে। সেদিন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্ররাই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পেত; বিদ্যাসাগর মহাশয় অধ্যক্ষ হবার একবছরের মধ্যেই ব্রাহ্মণেতর জাতির ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। রবীন্দ্র নাথ বিদ্যাসাগর চরিতে লিখেছেন,—"তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়

সেদিন বলেছিলেন, শূদ্রেরা যদি সংস্কৃত চর্চার অনধিকারী, তবে তাঁরা রাজা রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত চর্চ্চা বন্ধ করছেন না কেন ? অর্থের প্রলোভনে ম্লেচ্ছ সাহেবদেরই বা সংস্কৃত পড়ান কেন ?

গণতান্ত্রিক ভাবধারা এবং নতুন জীবনাদর্শের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রদ্ধা বড় গভীর ছিল। সেদিন তিনি সাংখ্য ও বেদান্ত পড়তে বাধ্য হলেও জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি মনীষিদের রচিত ইংরেজী গ্রন্থের সংগে ছাত্রদের পরিচিত করতে চান, যাতে তাদের আদর্শ ও যুক্তিধারা বেদান্ত ও সাংখ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে। বিদ্যাসাগর সেদিন স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেছিলেন,—"for certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the vedanta and shankhya in the Sanskrit College. That the vedanta and shankhya are false is no more a matter of dispute. Whilst teaching these in the sanskrit course, we should oppose them by sound Philosophy in English course to counteract their influence," বিদ্যাসাগর মানসের কোথাও 'বেদে আছে' মনোভাবের কোন পরিচয় আমরা পাইনি। যুক্তিবিচার ছিল তাঁর বিশ্বাস ও মননের মাপকাঠি। আধ্যাত্মিকতা, অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর যুদ্ধ-চেতনা। সকল দেশের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও তার সাধনার মূল ভিত্তি উপরি উক্ত মানস কাঠামো।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সোমপ্রকাশ কাগজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কাগজে তিনি সেদিনের কুখ্যাত নীলকরদের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। শুধু তাই নয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক অগ্রগতিকে মারাত্মক আঘাত হেনেছে বলে আজ আমরা উপলব্ধি করছি বিদ্যাসাগর

মহাশয় সেইদিনেই তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদও জানিয়ে ছিলেন তাঁর সোমপ্রকাশের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সমাজ সচেতন বিদ্যাসাগর মানসের পরিচয় আমরা পাই।

পরিশিষ্ট

১৯ শতকের চার্টার আইন ও ভারতের অর্থনৈতিক বিবর্তন

ইংরেজ আগমনেব প্রাক্‌কালে তো বটেই, এমনকি সাময়িক-ভাবে উত্তর কালেও ভাবতের কুটীর শিল্পজাত পণ্যেব বাজার পৃথিবীর অনেকখানি জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সেদিন এশিয়াব বিভিন্ন জায়গায় ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য, বিশেষ করে খাদ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় কুটীর শিল্পোৎপন্ন পণ্য রপ্তানী হত। বপ্তানী বাণিজ্য ভাবতবর্ষের সমৃদ্ধির যুগ তখনও চলেছে। বৃটিশ ঐতিহাসিক অবশ্য উল্টো কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বাংলার ক্ষেত্রে তাঁরা বলতে চেয়েছেন, দেশের অর্থনৈতিক অবনতি নাকি সুরু হয়েছিল আলিবর্দীব সময় থেকে। বর্গীর হাঙ্গামা উপলক্ষ করে দেশের অর্থনীতিতে ভাটার টান দেখা দিয়েছিল। এটি নিঃসন্দেহে বাস্তব ঘটনার বিকৃত চিত্র পবিবেশনের প্রয়াস। বাংলার গভর্ণর ভেরেলেষ্ট (১৭৬৭-৬৯) আলিবর্দীর আমলের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে কিন্তু বিপরীত প্রমাণই রয়েছে। ভেরেলেষ্ট লিখেছেন: 'The farmer was easy, the artisan encouraged, the merchant enriched and the princes satisfied'। অর্থাৎ সমৃদ্ধির পর্ব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল।

আর এক দিক থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। জগৎ শেঠরা হুণ্ডির কারবার এমনভাবে চালু করেছিলেন যে তাদের হুণ্ডিতে মধ্য-এশিয়াতে পর্য্যন্ত দেনা-পাওনা মেটানো যেত। এই বিস্তৃত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় দেশের বাণিজ্যিক প্রসারেরই লক্ষণ। আর এই বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে দেশে অর্থ আমদানিই বেশি হত, রপ্তানী বিশেষ হত না। পলাশির যুদ্ধের দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশ থেকে যে অপরিমিত হীরা, জহরৎ, সোনা, রূপা বিলেতে চলে

যায়, (যার মধ্যে ক্লাইবের নিজের অংশের লুটই ছিল ৪০ লক্ষ টাকা) তাকে মূলত বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের সঞ্চয় মনে করা অন্যায় হবে না।

সুতরাং বলা যায়, বিদেশী উৎপাদন ব্যবস্থা প্রসার লাভ করার পূর্বে কৃষি ও কুটীর শিল্পের যুগ্ম-উৎপাদনপদ্ধতিই ছিল ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য এবং তার সমৃদ্ধির কারণ। অথচ, রাষ্ট্রকাঠামো তখনও পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক; রাষ্ট্রীয় জীবনে, আইন-কানুন প্রবর্তনের বেলায় নবাব বাদশা আমীর ওমরাহ্‌রাই ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। কালক্রমে কুটীর শিল্পের প্রসার ও ব্যাপকতা বৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদনেব সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট বণিক-সম্প্রদায় আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তায় শুধু বিপুল বিত্তের অধিকারীই হলেন না, তাদের প্রভাব অর্থনৈতিক জীবনকে ছাপিয়ে ক্রমে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনযাত্রায়ও অনুভূত হতে থাকে। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে তদানীন্তন রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং পরবর্তী নুতন রাষ্ট্রীয় জীবনে বাংলা দেশে জগৎশেঠ, উমিচাঁদ (আমীরচাঁদ) ও পশ্চিম ভারতে অর্জুনজী-নাথজীদের প্রভূত প্রতিপত্তির সংবাদ পাওয়া যায়। দিল্লী এবং প্রাদেশিক দরবারে কোম্পানীর প্রতিপত্তিও মূলতঃ এদেরই দৌলতে।

কুটীর শিল্পের উন্নতির এই সময়টিতে দেশে অন্তর্বাণিজ্যের দুটি ধারা বয়ে চলেছিল। একটি ধারা আমীর-ওমরাহ্‌ ও তাদের উপর নির্ভরশীল অভিজাত সামন্ত সমাজের প্রয়োজন মিটাত; আর অন্য ধারাটি বিদেশী বণিকদের দরকারমত সরবরাহ যোগাত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তার পূর্ববর্তী বিদেশী বণিকরা মুনাফালোভীই ছিল, রাজ্যলোভ তখনও তাদের দেখা দেয়নি। অল্পমূল্যে ভারতবর্ষের কুটীর-শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে চড়া দামে বিদেশের বাজারে বিক্রয় এবং বিদেশীর পণ্য এদেশের বাজারে চড়া মুল্যে বিক্রয় করে মুনাফা বাড়ানোতেই তখন পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ নিবদ্ধ। আর

এ-কাজে দেশী সওদাগরদের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। অবশ্য ক্রমে দেখা গেল যে, রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রভাব না থাকলে শুধু আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যই নয়, আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ও বিশেষ লাভজনক হয় না। সরকার-প্রবর্তিত শুল্ক প্রতিবন্ধকের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। কাজেই বিদেশী বণিকসম্প্রদায় উঠতি দেশী সওদাগর ও শেঠজী-নাথজীদের সাহায্যে সরকারী শাসনব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সুরু করেন। স্বার্থসমৃদ্ধি ও আত্মপরায়ণতার প্রেরণায় দেশীয় বণিকসম্প্রদায় স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে; ভবিষ্যতের প্রতিযোগীরা এই সময় একে অন্যের সহযোগী। অবশ্য দেশী সওদাগর গোষ্ঠী ছাড়া কোম্পানী এ কাজে নবাবের বিশ্বস্ত কয়েকজন ভূস্বামীরও সাহায্য পেয়েছিল। জমিতে অর্থ-নিয়োগ তখন অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে, তার তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটানো এবং ধার দেওয়ার কারবারে মূলধন লগ্নী বেশী লাভজনক, উপরন্তু তাতে হাঙ্গামা কম। সুতরাং, সামন্তযুগের শেষ অবস্থায় স্বীয় স্বার্থের তাগিদে মাঝারি এবং ছোটখাট ভূস্বামী বণিকসম্প্রদায়ের দিকে ঝুঁকতে দেখলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না।

এমনি করে সামন্তযুগীয় সমাজকাঠামোর ভেতরেই নূতন অর্থনৈতিক শক্তি ও সমাজ বিন্যাসের সূচনা হয়, এবং জরাজীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ক্রমশ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এই ভাঙ্গন সুরু হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবে, নূতন সমাজ-সম্পর্কের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু পুরাতনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে—কিন্তু তার পাশাপাশি সংগঠনের কাজ চলল অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে। এই ভাঙ্গা-গড়ার নেতৃত্বে স্বাভাবিক ভাবে থাকা উচিত ছিল দেশীয় বণিকসম্প্রদায়ের হাতে, অথচ পশ্চাদ্‌পদতা ও সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুন নেতৃত্ব গিয়ে পড়ল অধিকতর শক্তিশালী বিদেশী বণিকসম্প্রদায়ের হাতে। নিজের স্বার্থে আঘাত লাগার ভয়ে তারা ভাঙ্গা বা গড়া কোনটাকেই ন্যায়সংগত

পরিণতির দিকে এগিয়ে নিলেন না। ভাঙ্গন অসম্পূর্ণ রেখেই গড়ার নামে ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রক্ষমতাকে আয়ত্ত করার কাজে হাত দিলেন।

এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার স্বরূপ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি তথ্য নজরে পড়বে।

অষ্টাদশ শতকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলা দেশে এক ধরণের স্থানান্তব শুল্ক (Transit duty) চালু ছিল। কিন্তু ক্ষমতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি ফরমানের সাহায্যে নিজেদের ব্যবসাকে এই শুল্কেব হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। 'দস্তক' দেখিয়ে কোম্পানীব সওদা দিব্যি শুল্কের হাত থেকে রেহাই পেত। বৈদেশিক বাণিজ্যে দস্তক ব্যবহারের অধিকাব অবশ্য নবাব কোম্পানীকে দিয়েছিলেন, কিন্তু আভ্যন্তরীন বাণিজ্যে তার এ-হেন অপব্যবহার নবাবেরও কল্পনাতীত ছিল। কোম্পানীর এজেণ্টদের অসততায় ও ঔদ্ধত্যে ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে ইংরেজ পতাকাবাহী কোন নৌকা বা জাহাজ আটক করার অধিকার আর নবাবের কর্ম্মচারীদের থাকলো না।

নবাবের সঙ্গে এ নিয়ে কোম্পানীর দীর্ঘদিন মতবিরোধ চলেছে কিন্তু ইতিমধ্যে দেশীয় সওদাগরদের অবস্থা ক্রমেই সংকটজনক হতে থাকে। কোম্পানীকে তার পণ্যের জন্য শুল্ক দিতে হয় না, অথচ দেশীয় বণিকদের এই শুল্কের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই। ফলে, অন্যায় সুযোগভোগের মধ্য দিয়ে একদিকে দেশীয় বণিকরা যেমন প্রতিযোগিতায় পরাজিত হতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্টার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

বিনা শুল্কে ব্যবসা চালাবার জন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা সেদিন নানাপ্রকার অত্যাচার, জুলুম ও নিপীড়নের আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত

হয়নি! অসহ্য উৎপাতে উত্যক্ত হয়ে নবাব মীরকাশিম তৎকালীন গভর্ণর ভ্যানসিটার্টের কাছে এক কড়া চিঠি লেখেন। চিঠিতে বলা হয়, কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারী, গোমস্তা ও এজেণ্টদের দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন জেলায় নবাবের শাসনব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তীকালে গভর্ণর ভেরেলেষ্টও কোম্পানীর গোমস্তাদের জুলুমের কথা বলতে গিয়ে বাংলার তৎকালীন নবাবের একটি পত্রের উল্লেখ করেছেন। সেই পত্রে জানা যায়ঃ 'They (the Company's Gomasthas) forcibly take away the goods and commodities of the riats, merchants etc. for a fourth part of their value; and by ways of violence and oppressions, they oblige the riat etc. to give five rupees for goods which are worth but one rupee······so that by means of these oppressions and by being deprived of the duties, I suffer yearly a loss of nearly twenty-five lakhs of rupees. (রমেশচন্দ্র দত্তের বইতে উদ্ধৃত)

এই প্রসঙ্গে কোম্পানীর অধিনস্থ বণিক উইলিয়ম বোল্টের সাক্ষ্যও উল্লেখযোগ্য; তিনি লিখেছিলেনঃ এদেশে বর্তমান আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনা এবং ভারতবর্ষকে ইউরোপের বাজারে পরিণত করবার জন্য নিয়োজিত মূলধন পরিচালনার ব্যাপার যে নিছক জুলুম হয়ে দাঁড়িয়েছে, একথা সম্পূর্ণ সত্য। এর কুফল প্রতিটি তাঁতি ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত প্রত্যেকটি কারিগর হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। দেশীয় শিল্পের প্রত্যেকটি পণ্যকে তাদের একচেটিয়া অধিকারে আনবার চেষ্টা করেছে সেদিন কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা।······in which English with their Banyans and black Gomasthas arbitrarily decide what quantities of goods each manufacturer shall deliver and prices he shall receive from them."

এর স্বাভাবিক পরিণতির কথা উল্লেখ করতেও বোল্ট ভোলেন নি। তিনি লিখেছেন: তন্তুবায় ও অন্যান্য কারিগরদের উপর এই স্বেচ্ছাচারী জুলুমের ফলে দেশে পণ্যের অভাব ঘটতে থাকে, দাম বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন কমতির ফলে ক্রমে ক্রমে রাজস্বও হ্রাস পেতে থাকে।

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই অসম-প্রতিযোগিতায় গোমস্তাদের স্বেচ্ছাচারী জুলুমেব মৌখিকভাবে অনুমোদন কবেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, আইনেরও সাহায্য নিয়েছিলেন। ১৭৯৩ সালেব ৩১নং রেগুলেশনে বলা হল: যে তাঁতি কোম্পানীর কাছ থেকে দাদন নেবে, সে তার তৈরী মাল আব কারো কাছে বেচতে পাববে না অথবা অন্য কাবো অধীনে চাকরী নিতে পাববে না। এই নির্দ্দেশ অমান্য করলে দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ্দ করা হবে। তাছাড়া কোন তাঁতি যদি একটির বেশী তাঁত চালায় বা একজনের বেশী কারিগর নিয়োগ করে তাহলেও সে "Shall be subject to a penalty of 33 percent of the stipulated price of cloth that he may fail to delever according to the agreement. এই রেগুলেশনের নামে তাঁতিদের উপর কী অমানুষিক অত্যাচার চালানো হত, রমেশ দত্ত তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয়। প্রথম আমলে বৃটিশ-বণিকদের দৃষ্টি সর্বদাই ভারতীয় বস্ত্র ও পশম-শিল্পের দিকে নিবদ্ধ। এর পিছনে ল্যাঙ্কাসায়ারের প্ররোচনা সহজেই অনুমান করা চলে। বাস্তব-ক্ষেত্রে তার ফলাফল দাঁড়ায় এই: ১৮২৪ সালে যেখানে ভারতে প্রেরিত বিলিতি কাপড়ের পবিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ গজ, ১৮৩৭ সালে তা ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজের উপরে ওঠে। আর এই সময়ের মধ্যে মসলিন ও তাঁত-শিল্পের কেন্দ্র ঢাকার জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে নেমে মাত্র ২০ হাজারে দাঁড়ায়।

শিল্পবিপ্লবোত্তর ইংল্যাণ্ডে ১৭৯৩ সালের এই রেগুলেশনকে নিয়ে

কম বাদানুবাদ হয়নি। সে মতবিরোধ নূতন অর্থনৈতিক প্রস্তুতির মুখে উঠতি শিল্পপতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে চলতি বণিকসম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংঘাতেরই অভিব্যক্তি। কোম্পানী মূলতঃ বণিক-পুঁজি নির্ভর হলেও শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে যে তার উপর আদৌ পড়েনি বা নূতন অর্থনৈতিক প্রেরণার ঝোঁক যে তাব মধ্যেও খানিকটা দেখা দেয়নি, এমন নয়। কোম্পানীর ডিরেক্টববর্গ ও কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের মধ্যে মতভেদ এই নূতন প্রবণতারই লক্ষণ। উঠতি শিল্পপতি-সম্প্রদায় ভারতের শিল্পবাণিজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস কবে, তার বাজার নষ্ট করে, নিজেকে প্রতিষ্টিত করতে চায়। চলতি বণিক সম্প্রদায় কিন্তু বৈদেশিক ও আভ্যন্তবীণ বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া খবরদাবি পেলেই খুশি থাকে। অথচ, বৃটেনেব শিল্পবিপ্লব সৃষ্ট নূতন অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভারতীয় কুটীব শিল্পজাত পণ্যেব প্রয়োজন ফুরিয়েছে, নুতন অর্থ-নৈতিক সম্ভাবনাকে সফল এবং সার্থক কবে তুলতে এখন তার বরং অফুরন্ত কাঁচামাল চাই। রেখে-ঢেকে চলবার নীতি বরদাস্ত করতে আর সে রাজী নয়।

প্রাক্তন ও নতুন অর্থনৈতিক প্রবণতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে ইতিহাসের নির্দ্দেশেই যে দ্বিতীয় দলের পরাজয় ঘটবে, তাতে সন্দেহ নেই। বণিক-পুঁজি তো আসলে সামন্তযুগীয় কৃষি অর্থনীতি ও শিল্পযুগীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যবর্তী স্তর; প্রাচীন সমাজ-কাঠামোর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তার পরাজয়ও অনিবার্য।

সুতরাং আপত্তিকারীরা যদিও বললেন, এই রেগুলেশনের বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাবে এবং ভয় দেখালেন যে, এর পরিণামে রাজস্ব হ্রাস পাবে, তবু সমস্ত আপত্তি উপেক্ষা করে আইন বলবৎ রইল। এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে ধ্বংস করার নীতি অতীতে নিন্দিত হলেও স্বার্থের গরজে এখন এ দেশের শিল্পকে আঘাত করে বৃটেনের তৈরী

মালে ভারতবর্ষের বাজার ভরিয়ে দেওয়ার কাজে কোম্পানীও আইনের সাহায্য নিতে কসুর করল না।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কমন্স সভায় Administration of Justice in India সম্পর্কে যে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়, তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

কমিটির বিবরণে বলা হচ্ছে : "The letter contains a perfect plan of policy both of compulsion and encouragement, which must in a very considerable degree operate destructively to the manufacturers of Bengal. Its effects must be to change the whole face of that industrial country in order to render it a field of the produce of crude materials subservient to the manufacturers of Great Britain."

এই 'perfect plan'টিকে বাস্তবে রূপ দিয়ে ভাবতকে কৃষি-কেন্দ্রিক কবে তোলাই ছিল কোম্পানীর উদ্দেশ্য। আব ইংল্যাণ্ডেব শিল্পোন্নয়নের পক্ষে এ ছিল আবশ্যিক। কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনীতি এর ফলে এক গুরুতর সংকটেব সম্মুখীন হল। কেবল যে কুটীব-শিল্পের বড় বড় কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব লোপ পেল তাই নয়, কর্ম্মচ্যুত অসংখ্য বেকার কারিগব জমির ওপর ভীড় বাড়াল। আর চাষী-সম্প্রদায় অবসরকালীন কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের স্বল্প-উপার্জনেও বিরাট আঘাত লাগল।

ভারতীয় কুটীর-শিল্পেব এই শ্বাসরোধকর পরিবেশ অন্য দিক থেকেও বিপর্যয় ঘনিয়ে তুলল। আগে যে পুঁজি কুটীর-শিল্পে এবং বাণিজ্যে নিয়োজিত হত, লগ্নীর ক্ষেত্র ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে আসায় তা এখন জমিতে নিয়োগ ছাড়া আর উপায় রইল না। বৃটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে এমনি করেই দেশীয় বণিক অভিজাতের প্রতিপক্ষ রূপে নূতন ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব। কাজটি কতটা সুপরিকল্পিত

ভাবে অনুষ্ঠিত, তা জানা যায় ১৭৯৩ সালের ৬ই মার্চ লর্ড কর্ণওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করার পক্ষে যে সব কোম্পানীর ডিরক্টরদের জানিয়েছিলেন তার বিবরণ থেকে : The public credit is high, the paper in circulation bearing an interest of 8 p. c. is selling at a premium of 1 percent and the interest of money is proportionately low. As the paper is in a course of payment their is every ground to expect that the large capitals possessed by the natives which they will have no means of employing when the public debt is discharged will be applied to the purchase of landed property as sons as the tenure is declared to be secured.'

বাঙ্গালী সওদাগর গোষ্ঠিব অর্থ-বিনিয়োগের যে পরিসর কোম্পানীর দৌবাত্ম্যে ক্রম-সংকীর্ণ হয়ে আসছিল, নানা দিক থেকে তার পথ আরো রুদ্ধ কবে দিলে (যা কর্ণওয়ালিস করেওছিলেন) বেনিয়ানরা অগত্যা জমিদাবী ক্রয়ের দিকে ঝুঁকবে, কর্ণওয়ালিস সে আশা পোষণ করতেন। ভারতকে কৃষিমুখী কবে তোলার যে প্রয়োজনীয়তা শিল্পবিপ্লবের তাগিদে জরুরী হয়ে উঠেছে, তার স্বার্থেও নূতন একদল ভূস্বামী সৃজন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ দরকার হয়ে পড়েছিল। কর্ণওয়ালিস জানতেন, এই ভূস্বামী শ্রেণীর অস্তিত্ব একান্তভাবে কোম্পানীরাজ-নির্ভর বলে, বৃটিশ-স্বার্থের বাইরে বেরুবার ক্ষমতা তাদের থাকবে না। উপরন্তু, এদের আবির্ভাব দেশীয় বণিক সম্প্রদায়কে আরও পঙ্গু করে তুলবে, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নির্বাধ এবং নিরঙ্কুশ হবে। বিত্তশালী ভারতীয়দের দৃষ্টিকে ভূমিকেন্দ্রিক করার এই উদ্দেশ্যই রূপ পেয়েছে কর্ণওয়ালিশ-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। কোম্পানীর পাহারা-

দারিতে নূতন ভূস্বামীদের স্বার্থসংরক্ষণের সুদৃঢ় ব্যবস্থা থাকায় জমিতে টাকা খাটানো বিত্তবানদের কাছে লোভনীয় হয়ে উঠল এবং নিজের স্বার্থে এই শ্রেণী ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় সক্রিয় পৃষ্ঠ-পোষক হয়ে দাঁড়াল। দেশের কৃষিসম্পদ একান্তভাবে পরনির্ভর ভূস্বামীশ্রেণীর অধিগত হওয়ায় বৃটিশ-শিল্পের রসদ যোগাবার কাজ অনেকটা নিশ্চিন্ত এবং নির্বিঘ্ন হল। স্বীয় স্বার্থবাহী অকুলীন এই ভূস্বামী সম্প্রদায়ের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীক জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহে এই কারণেই ইংরেজ সেদিন কম চেষ্টা করেনি। জমিদারদের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং সরকারী সভা সমিতিতে নূতন ভূস্বামীদের বিশেষ সম্মান-প্রদর্শনের নীতিও অনেকদিন অনুসৃত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরও এই পরিবর্তনের গুরুতর প্রভাব পড়ে। মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী শ্রেণী চাকরীর আকর্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে অগ্রসর হয়েছিল, এ-ধারণাকে আজকাল ঐতিহাসিকরা ভুল বলছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী একান্তভাবে বৃটিশ বণিক রাজত্বের সৃষ্টি—এ-সিদ্ধান্তও ঐতিহাসিক তথ্যসম্মত নয় বলেই জানা গেছে। তবে, বৃটিশ আমলের প্রথম দিকে বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দীরা যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর খানিকটা ভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আর ভারতীয় অর্থনীতির নূতন কৃষিমুখী রূপান্তরের ফলে পূর্বতন জীবিকাচ্যুত হয়ে তারা যে এই সময় থেকে সম্পূর্ণ রূপে চাকরি নির্ভয় হয় এবং বেন্টিঙ্কের. শিক্ষা-নীতি যে এই পরিবেশ-প্রস্তুতিতে অনেকখানি সহায়তা করে, তাও বোধহয় নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

শুধুমাত্র এতেই সন্তুষ্ট না থেকে সঙ্গে সঙ্গে পশম, তুলা চা, নীল, কফি ও রবার প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক কৃষি উৎপাদনগুলিকেও বৃটিশের একচেটিয়া অধিকারে আনার চেষ্টা চলল। ফলে,

গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য আরও প্রকট হয়ে দেখা দিল। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজের নীচু স্তরে জমির উপর চাপ-বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে জমির ক্রমিক বিভাজনের ফলে উৎপাদন-হ্রাস গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন সর্বহারা কৃষক শ্রেণীর সমস্যাকে জটিলতর করে তুলল। শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হলে এই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা কলে-কারখানায় নিয়োজিত হতে পারত। কিন্তু এখানে তার পথ বন্ধ বলে বাংলা, ছোটনাগপুর, মালাবার, করমণ্ডলের উদ্বৃত্ত কৃষিজীবি জনসংখ্যাকে কুলির কাজ নিয়ে ডারবান, জাঞ্জিবার মরিশাস প্রভৃতি দূর-দূরান্তরে পাড়ি জমাতে হল। সাগরপাড়ি দেওয়া সুরু ১৮১৯ সালে—কুলি চালান দেওয়ার একবার-নামা প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে; আর তা চরমে পৌছায় ১৮৩৩ সালে, দাসপ্রথা অবসানের অব্যবহিত পর।

মোট কথা, প্রথমে ইংল্যাণ্ড ও তার কিছু বাদে পশ্চিমী দেশ গুলিতে যখন সামন্তযুগীয় এবং উত্তরকালীন বণিক-পুঁজি-নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলে শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে নূতন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বদিয়াদ গড়া হচ্ছে, তখনই জোর করে ভারতের অর্থনীতিকে কৃষিকেন্দ্রিকতার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন থেকে ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের অগ্রগতির সাথে সাথে, তার ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদকে দৃঢ়তর করবার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে ভারতের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে। যে প্রতিক্রিয়া ইঙ্গিত হিসাবে সুরু হয় আঠারো শতকে তাই উনিশ শতকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মাধ্যমে রূপ নেয় সুনিশ্চিত নীতি ও কর্ম্মপন্থায়—যার প্রত্যক্ষ ফল ১৮১৩ এবং ১৮৩৩-এর সনদ এবং পরবর্তীকালের মহারাণীর ঘোষণা। বণিক-পুজির প্রতিভূ কোম্পানীর শাসনকর্তৃত্ব ঘুচিয়ে ভারতকে ধনিকস্বার্থের বাহক পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আনাও বৃটেনের তখনকার অর্থনৈতিক কাঠামোগত দাবীরই প্রত্যক্ষ ফল। অথবা

ঘুরিয়ে বলা চলে, বণিক-পুঁজির সঙ্গে ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ধনিক সম্প্রদায়ের যে পরাজয় ঘটল—তার ফলেই শাসনব্যবস্থার এই হাত-বদল।

বলা বাহুল্য, হাত-বদলের কাজটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নি। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে অবশ্য কোন প্রতিবাদ আসে নি, প্রতিবন্ধকও সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু বণিক-পুঁজি ও ধনিক শ্রেণীর পারস্পরিক সংঘাত কাজটিকে যথেষ্ট জটিল ও আবর্তময় করে তুলেছিল।

১৮১৩ সালের সনদ কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারে প্রথম হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা এবং ইংলণ্ডের রূপান্তরিত অর্থনৈতিক কাঠামো বণিক-পুঁজির প্রয়োজন যে ফুরিয়ে এসেছে তারও স্মারক। এই আইনে বৃটিশনাগরিকমাত্রেই বিশেষ লাইসেন্স নিয়ে ভারতে বাণিজ্য করবার এবং জমি কিনবার অধিকাব পেল। কোম্পানী ছাড়াও বিশেষ লাইসেন্সের অধীনে যে কোন ইংরেজ ব্যবসায়ীর পক্ষে বিলিতা পণ্যদ্রব্য ভারতে আমদানী করাব বাধা রইল না। রাজস্ব-হ্রাসের আশঙ্কায় ভারতীয় শিল্পকে সম্পুর্ণ ধ্বংস করে দেওয়ার বিরুদ্ধে কোম্পানীর তবু খানিকটা আপত্তি ছিল; কিন্তু কোম্পানীব আওতা বহির্ভূত নবীন আগন্তুকরা এদিক থেকে বেপরোয়া, রাজস্ব-লোভের পিছুটান তাদেব নেই। তাই উনিশ শতকের প্রথম দিকেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সম্পুর্ণ ধ্বংসের লক্ষণ দেখা দিল। ১৮ শতকের গোড়ার দিকে যেখানে প্রতি বছর এদেশ থেকে রপ্তানীকৃত মিহিবস্ত্রের আনুমানিক মূল্য ছিল ১০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯২২—২৩ সালে তা নেমে এলো ২·৫ লক্ষ পাউণ্ড। এই সময় ভাবতীয় বস্ত্রকে রপ্তানীব সময় এদিক থেকে, আমদানীর ক্ষেত্রে ওদিক থেকে দু-তরফা চড়া শুল্কের সম্মুখীন হতে হত।

এতো গেল ফলাফল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রূপান্তরিত অর্থনীতি নূতন ও পুরোনো ধনিকশ্রেণীর মধ্যে বিরোধটিকে ভালভাবে অনুধাবন না করলে এই সনদের উদ্দেশ্য সঠিক বোঝা যাবে না।

তার জন্য এই সময়কার ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পটভূমি-সম্পর্কে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

১৮৩২ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে পার্লামেন্টে প্রবেশের এক চেটিয়া অধিকার ছিল, মাত্র বড় বড় জমিদার ও 'রটন বারো'র মালিকদের। এই অধিকারও আবার মুষ্টিমেয় জমিদার পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর সীমা-পরিবেষ্টন নীতি ও শিল্প-বিপ্লবের ফলে বহু পুরোনো বরোর জনসংখ্যা যদিও কমে গিয়েছিল, এবং ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্মিংহাম, লীডস, শেফিল্ড প্রভৃতি নূতন শিল্পকেন্দ্রগুলোতে লোকের ভীড় দেখা দিয়েছিল, তবু জনবিরল বারোগুলিই যথারীতি পার্লামেন্টে প্রতিনিধি পাঠিয়ে চলছিল, অথচ জনবহুল নূতন শিল্পকেন্দ্রগুলি কোন প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার পায়নি। ভারত প্রত্যাগত 'নবাব'রা বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিস প্রত্যাগত ধনী ব্যবসায়ীরা টাকা-পয়সা নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এসে 'রটন বারো' কিনে পার্লামেন্টে প্রবেশের অধিকার অর্জন করত! বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা কিছুতেই নবোদ্ভূত ধনিক শ্রেণীর মনঃপুত হতে পারে না।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ক্রিষ্টফার উইভিলের নেতৃত্বে পার্লামেণ্ট সংস্কারের জন্য আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং তারপর মেজর জন কার্টরাইট পার্লামেণ্ট সংস্কারের জন্য জেহাদ ঘোষণা করেন। আন্দোলনটি নূতন ধনিকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় অধুনা-সম্প্রসারিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সে গনতন্ত্র ঘোষিত হয়, ১৭৯৩ এর জানুয়ারীতে লুই-এর হত্যা, ফেব্রুয়ারীতে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ, মার্চে রেভলিউশনারী ট্রাইব্যুনাল, এপ্রিলে কমিটি-অফ পাব্লিক সেফটি', মে মাসে 'জিরনডিন'দের পতন ও জাকবিন'দের উত্থান এবং তারপর 'টেরারে'র রাজত্ব সুরু হয়। ঘটনাগুলির প্রক্রিয়া ইংলণ্ডের উপর অনেকখানি ছায়াপাত করে এবং তার সুযোগ

নিয়ে পিট পার্লামেণ্ট সংস্কারের আলোচনা বন্ধ করে দেন সাময়িকভাবে হঠে গেলেও নূতন ধনিকগোষ্ঠী অবশ্য নিশ্চুপ বসে থাকেন নি।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের সময় নেপোলিয়ন ইউরোপের সকল বন্দরে বৃটিশ বানিজ্য জাহাজ নোঙর করা নিষিদ্ধ করে দেন; ফলে এই বিস্তৃত অঞ্চলে বৃটিশ পণ্য আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নিয়ে শিল্পপতিরা বেজায় মুস্কিলে পড়েন এবং নূতন বাজারের জন্য তাদের তরফ থেকে সরকারের কাছে দাবী জানানো এবং চাপ দেওয়া হতে থাকে। ১৮১৩র সনদ আসলে সেই দাবীরই স্বীকৃতি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মনীতি (মূলতঃ বণিক পুজির সামন্তমুখী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের নূতন সমাজ কাঠামোর প্রসার ও বিস্তৃতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর কোম্পানী যতই দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন হতে থাকে, ততই তাদের মধ্যে বণিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে রাজত্বও রাজস্ব লাভের ঝোক প্রবল হয়ে ওঠে। রাজস্ববৃদ্ধির দিকে নজব যাওয়ায় ব্যবসায়ের দিকটি ক্রমেই অবহেলিত হতে থাকে।

গোমস্তা ও এজেন্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষস্থানীয় অনেকের আপত্তি এমন কি প্রতিবাদের কারণও খুঁজলে এইখানেই পাওয়া যাবে। আসল কথা বৃটিশ বণিক পুঁজি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে দেশী সওদাগরদের হঠিয়ে দিয়েই খুশী ছিল, স্বার্থের পরিপন্থি বলেও এ দেশের শিল্পকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার ইচ্ছা বা আগ্রহ তার ছিল না। বোল্টের সাক্ষ্যে এই অনিচ্ছার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এই কারণেই ওয়ারেন হেষ্টিংস হেনরি ভ্যান্সিটার্টের কাছে লিখতে পেরেছিলেন: "I beg

leave to lay before you a grievance which calls loudly for redress······I mean the oppressions committed under the sanction of the English name and through the lack of spirit in Nawab's subject." হেষ্টিংস-এর আবেদনটি শুধু তার সহৃদয়তার চিহ্ন নয়, এটি বণিক পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণেরই প্রস্তাব। অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনে বণিক পুঁজির গতি যদিও ধনতন্ত্র অভিমুখী, তবু মনোভঙ্গির দিক থেকে তা সামন্তশাহীর অনুরাগী। তাই রাজস্ব হ্রাসের ভয় কোম্পানীকে যতটা উৎকণ্ঠিত করে, ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করার আগ্রহ তাকে ততটা উৎসুক করে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮২৫ সাল থেকে কোম্পানী ভারতে কোন বিলিতি পণ্য আমদানী করেনি এবং তার কিছুকাল পরে কাঁচা পশম, তৈরী পশম, নীল ও সোরা (saltpetre) ছাড়া অন্যান্য পণ্য ইংল্যাণ্ডে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল। আরও মজার কথা, এই সময় কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ ভারতে বৃটীশ পণ্য দ্রব্যের কতটুকু চাহিদা হওয়া সম্ভব, সে সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে ওয়ারেন হেষ্টিংস খোলাখুলি বলেছিলেনঃ হতদরিদ্র ভারতবাসীর প্রয়োজন বলতে বিশেষ কিছু নেই; আর নিতান্ত যেটুকু না হলেই নয়, তা তারা এদেশেই পেয়ে থাকে। স্যার জন ম্যাল্‌কম বলেছিলেনঃ ভারতবাসীর ক্রয় ক্ষমতা নিতান্ত কম বলে তিনি মনেই করেন না যে তারা কখনো বৃটীশ পণ্যের ক্রেতা হতে পারে।

এইসব বিরূপ মন্তব্য ইংল্যাণ্ডের নূতন শিল্পপতিদের পক্ষে নিশ্চয়ই শ্রুতিমধুর হয়নি। ১৮১৩-র চার্টারে তাই ইংল্যাণ্ডের বর্হিবাণিজ্য প্রসারিত করে ভারতের বাজার দখলের প্রচেষ্টায় কোম্পানী ও কোম্পানীর কর্মচারীদের চেয়ে কোম্পানী বর্হিভূত নূতন বণিকদের প্রাধান্য দেওয়া হল।

কিন্তু প্রথম দিকে এরা বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। একে তো বহুদিন যাবত সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর অস্তিত্বই এক বিরাট প্রতিবন্ধক, অধিকন্তু আগন্তুকদের বিরুদ্ধে কোম্পানী ও কোম্পানীর কর্মচারীদের অনধিকার হস্তক্ষেপেরও অভিযোগ উঠলো।

ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও এদিকে ভীষণ দুর্যোগ দেখা দিয়েছে। ১৮১৫-এর সন্ধির পর জনসাধারণ যখন সুদিনের আশা করেছে, তখনই ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিল। জিনিষপত্রের দামও হঠাৎ অসম্ভব কমে গেল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল শ্রমিকের সংখ্যা ও মজুরী হ্রাস। অন্যদিকে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম কমে যাওয়ায় জমিব মালিকেরা এবং বড় বড় খামারের অধিকারীরা চাষীদের পাওনা এবং 'পুয়োর-ল' অনুযায়ী দেয় ভাতা কমিয়ে দিল।

যুদ্ধের দরুণ জাতীয় ঋণেব বোঝা ভারী হয়ে উঠেছিল এবং এই মূল্যসঙ্কোচের জন্য সে বোঝা আরো স্ফীত হল। আয়কর তুলে দেওয়ায় দরিদ্র সাধারণের উপর করভার আরও ভাবী হয়ে চাপল। জমিদারদের স্বার্থে শস্যশুল্কেরও সামান্য পরিবর্তন করা হল, দেশের বাণিজ্য এবং কৃষিব এই অবস্থায় লোকের দুর্দ্দশার আর অন্ত রইলো না আর দুর্দিনের পরিণতিরূপে নানা জায়গায় মেশিন ভাঙ্গা ও অনশনজনিত গোলযোগ দেখা দিল। বিপ্লব-সম্ভাবনার সামনে বণিকপুঁজি ও নূতন শিল্পপতিদের সংঘাত কিছুদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু ১৮২৫ সালে অর্থনৈতিক অবস্থার অনেকটা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধণিকশ্রেণী আবার শস্যশুল্ক ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে এবং সস্তায় কাঁচামাল পাওয়ার দাবী জানায়। অথচ, ভারতবর্ষে কোম্পানীর মনোভাব তখনো অপরিবর্তিত। ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিক লিখেছেন: 'If all

the articles of manufacturing produce of India were swept away and no new ones created to supply this vaccum it will no longer be possible to release the revenue at its present normal amount," বেন্টিঙ্কের এই উক্তি নূতন শিল্পপতি সম্প্রদায়েব চোখে রাজস্ব লোভের আচ্ছন্ন দৃষ্টি মনে হওয়াই স্বাভাবিক। যে আচ্ছন্ন দৃষ্টি রাজস্ব-হ্রাসের আশঙ্কায় ভারতীয় শিল্পকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে ভয় পায় বলা বাহুল্য তাব সঙ্গে নূতন ধণিকশ্রেণীর বিরোধ অনিবার্য্য। পার্লামেন্টের সংস্কাব ছাড়া তাদের দাবী গৃহিত হবে না উপলব্ধি করেই এঁরা র‍্যাডিক্যাল ও শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দিয়ে নূতন পার্লামেণ্ট সংস্কারের প্রচেষ্টায় মাতে। যার ফলে ১৮৩০ সালে গ্রে'র রিফর্ম বিল; ১৮৩২ সালে বিলটি গৃহীত হয়।

১৮৩৩ সালের সনন্দকে নূতন পার্লামেণ্ট-সংস্কারের প্রত্যক্ষ ফল বলা যেতে পারে। ১৮১৩ সালের চার্টারে তবু বিশেষ লাইসেন্সের বাধানিষেধ ছিল, এবারে সে-আপদও দূর হল। ভারতের প্রতি ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গী এই প্রথম নূতন অর্থনীতি প্রয়োজনে অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) ও laissez faire নীতি অনুযায়ী আমূল ঢেলে সাজা হল। এর কিছুকাল আগে থেকেই আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ নীতির সাহায্যে গোটা পৃথিবীর শিল্প ও ব্যবসাকে একটি মাত্র সমবায়সংগঠনে পরিণত করার সার্থকতা প্রচার করতে শুরু করেছিলেন ইংরেজ অর্থনীতি-বিদদের মানচেষ্টার গোষ্ঠী (Manchester School of Economics)। মানচেষ্টার গোষ্ঠীর মূল বক্তব্যটি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দাঁড়ায় এই: ভারত কৃষিনির্ভর এবং ইংল্যাণ্ড শিল্পপ্রধান দেশ বলে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ নীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষ বিনা দ্বিধায় তার কৃষি উৎপাদনকে ইংল্যাণ্ডের

যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় রসদ যোগাবার কাজে লাগাবে এবং বিনিময়ে তার কাছ থেকে তৈরী পণ্যদ্রব্য পাবে। তাঁদের মতে পারস্পরিক স্বার্থেই ব্যবস্থাটির প্রচলন প্রয়োজন এবং উভয় দেশের পক্ষেই তা সমান সুবিধাজনক। তাঁরা আরো বলেন: আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ অনুযায়ী প্রত্যেকটী দেশই আন্তর্জাতিক সমবায় শিল্পসংগঠনের এক একটী ইউনিট, তাই নিতান্ত দৃষ্টিকটু-রূপেই প্রকট হল। ১৮৪০ সালে 'হাউস অব কমন্স কমিটিতে' এই নীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মণ্টোগোমার মার্টিন বলেছেন: "We have during the period ··compelled the Indian territories receive our manufactures ; our woolens duty-free, our cottons at 2 p. c. and other articles in proportion, while we have continued during that period to levy almost prohibitory duties or duties varying from 10 to 20, 30, 50, 1000, 500 and 1C00 percent upon articles, the produce from our territories···I do not consider that it has been in the fair course of trade ; I think it has been the power of the stronget over the weaker" অর্থাৎ নামে অবাধ বানিজ্য হলেও, নির্বাধ সে শুধু একতরফা ইংল্যাণ্ডের নূতন শিল্পপতি সম্প্রদায়ের পক্ষে।

আরো একদিক থেকে এই সনদের প্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে উঠেছিল। ১৮ শতকের শেষ ভাগ এবং ১৯ শতকের সুরু থেকেই ইংল্যাণ্ডের টাকার বাজার (money market) দ্রুত সংগঠিত হয়ে উঠেছিল এবং ক্রমে ইংল্যাণ্ডের ভৌগলিক সীমানা অতিক্রম করে অন্যান্য দেশে মূলধন লগ্নীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ডের চোখে ভারতবর্ষ একটি প্রতিযোগিতাবিহীন উপযোগী ক্ষেত্র; অথচ কোম্পানীর অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রম

মূলধনের প্রসারের পরিপন্থী। তাই প্রথমে ১৮১৩ সালের এবং পরে ১৮৩৩ সালের সনদে নূতন মূলধন নিয়োগের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এর অর্থই হচ্ছে কোম্পানী-বহির্ভূত মূলধন ও কারিগরি বিদ্যাকে ভাবতে আমন্ত্রন জানানো। হল্ট ম্যাকেঞ্জী ১৯৩২ সালে বলেছিলেন: I am not very sanguine as to the introduction of capital by direct remittance ,though it may be done to a certain extent by commercial speculators employing agents···there seems to be scope for men of education, good character and industry. Evry European of suitable qualifications, character and industry, who landed in Bengal, if befriended and supported for a short time would, I think become a capitalist by force of that character and industry; at the same time the speculators from home might send out capital.' অর্থাৎ ম্যাকেঞ্জি শুধু মূলধন পাঠিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না, ইংল্যাণ্ডের ক্রম-প্রসারণশীল মধ্যবিত্তদের একটা সুরাহা করতে এবং তাদের মাধ্যমে কাঁচামালের সরবরাহের ব্যবস্থাকে নিরাপদ করতেও চেয়ে ছিলেন। ১৮১৩ সালের চার্টার অনুযায়ী কোম্পানী বহির্ভূত যে সব ইংরেজ ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে আসতে সুরু করেন নূতন কাজের উপযোগী করে বৃটেনের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুতের ভার মূলতঃ তাদের উপরই ছিল। ১৮৩৩ সালের সনদ এই নবাগতদের বনিয়াদকে দৃঢ়তর করে। লক্ষনীয় এই যে, এই সনদ গৃহীত হবার দু'তিন বছরের মধ্যেই নূতন শিল্পপতিদের প্রতিভূ হিসাবে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স (১৮৩৬) বোম্বাই চেম্বার অব কমার্স (১৮৩৭) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে এবং এদেশে

বৃটিশ পণ্যের বাজার ব্যাপক ও সুদৃঢ়, কঁচামালের বাজার নিরাপদ নিশ্চিত করার কাজে লাগে। কোম্পানী যেমন ছিল বণিক-পুঁজির বাহন, এরা তেমনি নূতন ধণিকশ্রেণীর এজেন্ট।

এই দিক থেকে ১৮৩৩ সালের সনদ ভারতীয় শিল্পের প্রতি শেষ এবং চরম আঘাত। পক্ষপাতমূলক ব্যবহারে ভারতীয় শিল্প অনেকদিন যাবতই মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর দিন গুনছিল এই শেষ আঘাত তার মৃত্যুকে অবধারিত করে তুলল। ইংল্যাণ্ডের প্রসারণশীল সমাজকাঠামোর তাগিদে অবশ্য এ ছাড়া উপায়ন্তরও ছিল না। ১৯ শতকের মধ্যাহ্নে, বরং বলা যায় তার কিছুটা আগেই, বৃটিশ ধনতন্ত্র বিকাশের চরম শিখরে পৌছায়। মূলধন লগ্নীর মাধ্যমে শিল্পউন্নয়নের এই অগ্রগতিকে তখন থেকে ইংল্যাণ্ডের ভৌগলিক সীমানার বাইরে প্রসারিত করতে না পারলে Law of Diminishing Return অনিবার্য হয়ে উঠত; পড়তি দাম এবং মুনফা-হ্রাস ঠেকানো যেত না। সুতরাং মুনাফা বাঁচিয়ে রাখার আগ্রহে উদ্বৃত্ত মূলধন বাইরে রপ্তানীর কথা ভারতে তারা বাধ্য।

তাই দেখা গেল, ১৯ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই বৃটিশ মূলধন ভারত এবং প্রাচ্যাভিমুখী। সেই মূলধনই পরবর্তীকালে ভারতে আধুনিক শিল্পযুগের পত্তন করেছে। অবশ্য তা ইতিহাসের আরেক পর্ব। (লেখকের প্রবন্ধ—'ক্রান্তি' মাসিক পত্রিকা হইতে)।

ভূমিনীতি ও ভূমিসম্পর্ক—প্রাক্-কোম্পানীর আমল

প্রাক্-বৃটিশ আমলে ভারতের ভূমি ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল, সেদিন য়ুরোপের মত বা বৃটিশ রাজত্বের দিনে প্রতিষ্ঠিত সামন্ত-তান্ত্রিক ভূস্বামী জমিদারের মত কোন শ্রেণীর ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে সেদিন অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু, বৌদ্ধ

অথবা মুসলমান রাজাদের রাজত্ব কালে যে সকল সামন্ততান্ত্রিক ভুস্বামী শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তাঁরা সেদিন শুধুমাত্র নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি গ্রামের রাজার প্রতিনিধি হিসাবে কর আদায় করার অধিকার ভোগ করতেন—আজকের জমিদারের মত জমির ওপর কোন মালিকানা তাঁদের ছিল না। তাঁরা কেবল রাজার হয়ে এই সকল গ্রাম থেকে রাজস্বই আদায় করে যা পেতেন তার একটি অংশ নিজেরা রেখে রাজাকে বাকী অংশ দিতেন।

প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে ভারতের মাটিতে ম্যানর ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব ছিল না।

আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল সেদিন রাজাদেরও জমির ওপর কোন মালিকানা ছিল না। তাঁরা কেবল উৎপাদনের একটি অংশ রাজস্ব হিসাবে পেতেন।

ভূমি ছিল গোটা গ্রামীন গোষ্ঠি বা পঞ্চায়েতের মালিকানায় এবং ভূমি কখনই রাজাব সম্পত্তি বলে গণ্য হত না।

সামন্ততান্ত্রিক ও রাজকীয় কোন ব্যবস্থাতেই সেদিন জমিতে কৃষককুল ছাড়া অন্য কারও মালিকানা স্বীকৃত ছিল না।

আর যেহেতু জমিতে রাজার কোন মালিকানা ছিল না—যেহেতু রাজার পক্ষে সেদিনের সামন্তদের জমির মালিকানা প্রদান করাওসম্ভব ছিল না। এইসব সামন্তদের রাজা শুধুমাত্র তাঁর হয়ে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দিয়ে ছিলেন। সেদিন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান কোন রাজার আমলেই গ্রামীন সংঘ বা পঞ্চায়েতগুলির এই জমির মালিকান থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হয়নি। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে সেদিন, জমিতে কৃষকদের ব্যক্তিগত কোন অধিকার ছিল না—গ্রামের সমষ্টিগত মালিকানা প্রচলিত ছিল। রাজার রাজস্ব গ্রামগত ভাবেই ধার্য্য হত, ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের উপর ধার্য্য করা হত না। (এই প্রসঙ্গে পুস্তকের গোড়াতে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।)

এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল বৃটিশ আমলে নূতন ভূমি নীতি প্রবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে। ' এই নীতি অনুসারে গ্রাম-গুলি জমির উপর তাদের প্রচলিত গোষ্টিগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'ল এবং দুই রকমের নূতন ধরনের মালিকানা এই সব অঞ্চলে প্রচলিত হ'ল—দেশের কতক অঞ্চলে চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা এবং অপর এলাকায় কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। যারা সেদিন রাজার হয়ে রাজস্ব সংগ্রহ করতো—তারাই চিরস্থায়ী প্রথায় জমির মালিক হল। এমন করেই ভারতের জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়—ভারতের ইতিহাসে এর ব্যবস্থা সেদিন সম্পূর্ণই অপরিচিত ছিল।

অর্থাৎ ইংরেজ প্রবর্ত্তিত ভূমিনীতির ফলে ভারতের গ্রামীন অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কৃষিকার্যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হ'ল। ভূমি-সম্পর্কের এই পরিবর্ত্তন প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সামন্তযুগীয় অর্থনীতির পরবর্ত্তী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিবর্ত্তনে যে সকল কারণ সক্রিয় ছিল তার মধ্যে অন্যতম।

নূতন ভূমিনীতি প্রবর্ত্তিত নূতন ভূমি-সম্পর্ক ও ভূমি রাজস্বের ফলে বিগত দিনের শুধুমাত্র গ্রামের প্রয়োজন মিটানই গ্রাম্য পঞ্চায়েত পরিচালিত কৃষির যে উদ্দেশ্য ছিল তার পরিবর্ত্তে অন্দরে বাহিরে বাজারের এবং বিক্রয়েই কৃষি অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। (The produce were now ditermined by the new objective, that of sale and hence, changed character.—Deshai—Social background of India nationalism). এই নূতন ব্যবস্থাতে কৃষকেরা বাজারের জন্য উৎপাদন করতে আরম্ভ করল—এবং বাজার যোগাযোগ

ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে বিস্তৃতি হতে থাকে। অর্থাৎ কৃষির বানিজ্য করণ (Commercialisation of agriculture) সুরু হল। আর এই Commercialisation ব্যাপক হয়েছিল সেইসব এলাকাতেই যেসব এলাকায় ফসল উৎপাদন করা হত দেশ থেকে রপ্তানী করার উদ্দেশ্য। এছাড়া সকল উৎপাদনও সোশালাইজ করা হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডে শিল্পেব ব্যাপক বিকাশের ফলে ঐসব শিল্পের জন্য প্রয়োজন হ'ল কাঁচামালের। কাজেই এদেশে সেদিন ইংরেজ গভর্ণমেন্ট সেই অনুযায়ী অর্থনীতিব অনুসরণ করলেন যাতে বৃটিশ শিল্পের উপযোগী কাঁচামালেব উৎপাদনেব এলাকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় আবাব সাথে সাথে এদিকেও তাঁরা নজর বেখেছিলেন, যাতে দেশেব খাদ্য উৎপাদনেব পরিমান বৃদ্ধি পায় বৃটেনেব ক্রমবর্দ্ধমান জন সাধাবণের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে। এই প্রকারে দেশেব কৃষি পণ্যেব বাজার তৈয়ারীর প্রচেষ্টা চলেছিল ওদের দেশে—ফলে এদেশে কৃষির Commer cialisation ও Specialiasation ব্যাপক হতে থাকে। এই নীতির মাধ্যমে আবও একটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল সেদিনের কাঁচা টাকাওয়ালা বিত্তবান লোকের এদেশে শিল্প বাণিজ্যেব অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ দেখে জমিতে টাকা খাটান সুরু করলেন। আর এই টাকা খাটানটা সেদিন উপরিউক্ত কারণে খুবই লাভজনক ছিল। ফলে ভারতবর্ষের সেদিনের সঞ্চয় শিল্পমুখী হয়নি। বৃটেনের হয়েছিল সুবিধে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্মুখীন হতে হল না। এ বিষয়ে পূর্ব্বে বিশদ-আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ২

পণ্য ও ঐশ্বর্য্যের (Treasure) আমদানী ও রপ্তানী (সরকারী ও বেসরকারী)

(হাজার পাঃ ষ্টার্লিংয়ের হিসেবে) †

গড় হিসাব	পণ্য			ঐশ্বর্য্য			মোট হিসাব	স্বর্ণ		
	আমদানী	রপ্তানী	মোট	আমদানী	রপ্তানী	নিট্ আমদানী	পণ্য+ঐশ্বর্য্য	আমদানী	রপ্তানী	মোট
১৮৬৪-৬৫ থেকে ১৮৬৮-৬৯	২৯,৮৯৮	৫৪,৭০৩	৮৪,৬০১	১৭,২৭৮	১,৭৬০	১৫,৫১৮	১০৭,৬৩৯	৬০৩৮	৩১৪	৫,৭২৪
১৮৬৯-৭০ „ ১৮৭৩-৭৪	৩০,০৮৪	৫১,৬৩৯	৮১,৭২৩	৭,৭১৮	১,৪৩৩	৬,২৮৫	৯০,৮৭৪	৩,১০৭	১৭৯	২,৯২৮
১৮৭৪-৭৫ „ ১৮৭৮-৭৯	৩৩,৫৩০	৫২,৮১০	৮৬,৩৪০	৮,৬০৮	২,৪৩৩	৬,১৭৫	৯৭,৩৮১	১,৪৮২	৮৮৮	৫৯৪
১৮৭৯-৮০ „ ১৮৮৩-৮৪	৪১,২৯৪	৬৪,৭৯৮	১০৬,০৯২	৯,৫৯৪	১,০৯৪	৮,৫০০	১১৬,৭৮০	৩,৪৭৭	৮৩	৩,৩৯৪
১৮৮৪-৮৫ „ ১৮৮৮-৮৯	৪৫,১২৫	৬৫,১৩৫	১১০,২৬০	১০,০৫২	১,২০৭	৮,৮৪৫	১২১,৫১৯	২,৫৩৭	২৩৯	২,২৯৮
১৮৮৯-৯০ „ ১৮৯৩-৯৪	৪৭,৭২৬	৭০,৭৫২	১১৮,৪৭৮	১১,৯৬৭	২,৪১১	৯,৫৫৬	১৩২,৮৫৬	২,৯৩৬	১,৩৭৪	১,৫৬২
১৮৯৪-৯৫ „ ১৮৯৮-৯৯	৪৩,৫৩৮	৬৪,৭০৭	১০৮,২৪৫	৯,১২৮	৩,৮৭১	৫,২৫৭	১২১,২৪৪	৩ ৪০৪	১,৮৯৪	১,৫১০
১৮৯৯-১৯০০ „ ১৯০৩ ০৪	৫৬,৪৫২	৮৩,২৮১	১৩৯,৭৩৩	১৭,৩৪১	৭,৭৬৭	৯,৫৭৪	১৬৪,৮৪১	৮,৬৬৬	৪,৫৪৪	৪,১২২

উৎপাদন তালিকা †

বৎসর	কাঁচা পাট ১ লক্ষ (গাঁইটের হিসেবে)	কাঁচা তুলা (গাঁইটের লক্ষ হিসেবে)	ভারতে তৈরী কার্পাস পণ্য (পাউণ্ডের হিসেবে) (সূতা ও বোনা পণ্য)	চাউল '০০০ টন	গম '০০০ টন	চা ১০ লক্ষ পাঃ	কয়লা '০০০ পাউণ্ড	বাণিজ্য গতি প্রকৃতির সূচক সংখ্যা
১৮৯০	৩০	*	*	*	*	*	*	—
১৮৯১	৫৭	১৭	*	১৫,৭৪০	৬,০৯৪	১২৪	২'১৬৯	৯১
১৮৯২	৫০	২২	*	২১,০১৪	৭,৬৫৯	১২২	২,৩২৯	১০১
১৮৯৩	৬১	২৫	*	২২,৯৫৬	৭,২৬৯	১৩২	২,৫৩৮	১০৫
১৮৯৪	৫৬	২২	*	২৪,৮৯৫	৬,৯৯৯	১৩৫	২,৫৬২	১১০
১৮৯৫	৫৭	২৭	৪৩২	২০,৭৬৮	৫,৩৮০	১৪৩	২,৮২৪	১০৯
১৮৯৬	৬৮	২৩	৫০৬	১৩,৭৮৪	৫,৩৬৩	১৫৬	৩,৫৪০	১০৭
১৮৯৭	৫৩	২৫	৫৫৪	২৪,৯১৮	৭,২০৮	১৫৪	৩,৮৬৪	১২৪
১৮৯৮	৫৪	৩০	৬১৪	২৫,২৮২	৬,৮৩৮	১৫৭	৪,০৬৬	১২৮
১৮৯৯	৬৫	১১	৬১২	২২,৫৭৮	৫,৩৫৭	১৮২	৪,৬০৮	১৩১
১৯০০	৭৪	৩০	৪৫২	২০,৬৭৫	৭,০৯৪	১৯৭	৫,০৯৩	১৪৬
১৯০১	৭৬	২৭	৬৯৩	১৯,২১৫	৬,০৯১	১৯১	৬,১১৯	১৫৫

* হিসাব পাওয়া যায় নি।

† সূত্র: (১) রয়াল কমিশনের সম্মুখে ব্যাঙ্কারদের সাক্ষ্য
(২) ফিণ্ডলে সিরাস—The Indian Finance and Banking

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়—১ প

৩টি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের মূলধন, রিজার্ভ, আমানত ও বক্রী টাকার (Cash Balance) হিসাব

(কোটি টাকার হিসাবে)

বৎসর	আদায়ীকৃত মূলধন	রিজার্ভ উদ্বৃত্ত	মোট	আমানত		বক্রী টাকা
				সরকারী	বেসরকারী	
১৮৭০	৩ ৪	·৩	৩ ৬	৫·৪	৬ ৪	১০·৪
১৮৮০	৩·৫	·৬	৪·১	২ ৯	৮·৫	৭·৪
১৮৯০	৩·৫	১·০	৪ ৫	৩ ৬	১৪ ৮	১৩·০
১৯০০	৩·৬	২·০	৫ ৬	২ ৮	১২·৯	৫ ০
১৯০৫	৩·৬	২·৬	৬ ২	৩·১	২২·৩	৮ ২
১৯০৬	৩ ৬	২·৮	৬ ৪	৩·১	২৭ ৪	১১·০

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়—২ প

প্রধান ভারতীয় জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কের মূলধন, রিজার্ভ, আমানত ও বক্রী টাকার হিসাব (লক্ষ টাকায়)

বৎসর	সংবাদ-দাতা ব্যাঙ্কের সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন	রিজার্ভ (লক্ষ টাঃ)	মোট	আমানত	বক্রী টাকা
১৮৭০	২	৯·৮	১ ৮	১১·৬	১৩ ৯	৫·১
১৮৮০	৩	১৮·০	৩·১	২১·১	৬৩·৪	১৬·৬
১৮৯০	৫	৩৩·৫	১৭·৬	৫১·১	২৭০·৮	৫৫ ৮
১৯০০	৯	৮২·১	৪৫·৬	১২৭·৭	৮০৭·৫	১,১৯·০
১৯০৫	৯	৮৪·৬	৭৭·৮	১৬২·৪	১১৯৮·৯	১,৭৩ ৫
১৯০৬	১০	১৩৩·৯	৫৬·৪	১৯০·৩	১১৫৫·৫	১,৪৯·৫

—গ্রন্থপঞ্জী—

(১) রমেশচন্দ্র দত্ত—Economic History of British India under early British Rule.

(২) বুকানন—The Development of capitalist Enterprise in India.

(৩) কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস—Letters on India.

(৪) মেজর বি, ডি, বসু—(i) Ruin of Indian trade and Industries. (ii) Oudh and the East India Company.

(৫) রামচন্দ্র রাও—Decay of Indian Industries.

(৬) রাজা রামমোহন রায়—English works.

(৭) নির্মলচন্দ্র সিংহ—Indo-British Economy Hundred years Ago.

(৮) ডি, আর গ্যাডগিল—The Industrial Evolution of India.

(৯) হল্যাণ্ড—Bombay—I

(১০) ডগলাস—Bombay—I

(১১) ডাউ—Hindoosthan (Vol—I).

(১২) হবসন—Export of capital.

(১৩) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১) সংবাদপত্রে সেকালের কথা। (২) Cullings from Bengali News Papers.

(১৪) লেকী—History of England in the 18th Century.

(১৫) দেশাই—The Social Background of Indian Nationalism.

(১৬) Calcutta Review.

(১৭) জে, সি, সিংহ—Economic Annals of Bengal.

(১৮) কুক্—Rise, Progress and present condition of Banking in India.

(১৯) দুর্গাপ্রসাদ—Foriegn Trade.

(২০) ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার—উনিশ শতকের ভারত পথিক।

(২১) লেখকের—বিদ্যাসাগর—রাষ্ট্রনৈতিক মানসের ভূমিকা, (ভারতবর্ষ)।

(২২) বন্দোপাধ্যায়—(i) Fiscal Policy in India. (ii) Indian Finance.

(২৩) শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ

(২৪) মিত্র—Memoiers of Dwarkanath Tagore.

(২৫) মুখোপাধ্যায় রাধাকমল—Economic History of India 1600—1800

(২৬) কার্ল মার্ক্স—Capital.
(২৭) পল ব্যারান—Political Economy of Growth.
(২৮) রানাডে—Essays on Indian Economics.
(২৯) হেনরী টুকার—Memoirs of an Official of Indian Government.
(৩০) রবার্ট ওর্ম—History of the military transaction of the British Nation in Indosthan Vol. II
(৩১) জেঙ্কস্—Migration of British Capital.
(৩২) মোরল্যাণ্ড—Akbar to Aurangzive.
(৩৩) গোলাম হোসেন খাঁ—Suir Mutagharin.
(৩৪) লঙ্—Selection from unpublished records of the Government.
(৩৫) দত্ত—Studies in the History of Bengal.
(৩৬) ম্যালকম্—Memoier of Central India.
(৩৭) সারদারাজু—Economic Condition.
(৩৮) গুপ্ত—The last Peswa and The English Commissioners.
(৩৯) বোম্বে গেজেটার—
(৪০) এ. কে. কোনেল—Economic Evolution and Public works Policy.
(৪১) হ্যারিস—Life of J. N. Tata.
(৪২) রমেশচন্দ্র মজুমদার—Ancient Indian Colonies in the Far East. Vol—(I)
(৪৩) কেণ্ডোপি—Indian over Seas.
(৪৪) সিরাস—Indian Finance and Banking.
(৪৫) হানসার্ড—Parliamentary Debates.
(৪৬) Parliamentary Papers :
(ক) Report from Select Committee.
(খ) Minutes of Evidence.
(গ) Papers Re. Introduction of Indian Labourers into Mauritius.
(৪৭) ইম্পিরিয়াল গেজিটিয়ার
(৪৮) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর।